ভাগীরথী বহে ধীরে

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা,
কালোহ্যয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী।

—ভবভূতি

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৯

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

বেঙ্গল পাবলিশার্স,

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

'মুদ্রণী'

৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

স্ব-কর্ম্মধামগতায়া ভগিন্যা বামনদাসী দেব্যাঃ স্মৃতিমুদ্দিশ্য—

কল্যাণি ভগিনি,

অযথাকাল-লোকান্তর-গতায়া স্তে যদি কিঞ্চিদপি সুখমুৎপদ্যতে ইতি নিশ্চিত্য সমর্পিতেয়ং পুস্তিকা—

—স্ব-তর্পণমস্ততে—

জ্যেষ্ঠ-সোদরেণ

বোনটি আমার,

তোর লোকান্তরিত আত্মা তৃপ্তিলাভ করুক।

—দাদা

গ্রামটা খুব বড়, তাই বহু বিচিত্র জীবনের সমাবেশ হয়েছে; ধনী আর দরিদ্র শুধু নয়, রোগী, ভোগী, বিলাসী, বদমাইস; মানুষ, অমানুষ সব রকমই আছে এখানে। এদের সবার চোখের উপর দিয়ে অজয় নদ বয়ে চলেছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হতে; বর্ষায় কোনো কোনো বছর ডুবিয়ে ভাসিয়ে কিছু কিছু মানুষ-গরু-ছাগল কেড়ে নিয়ে এদের বুঝিয়ে দিয়ে যায়—মানুষ কত তুচ্ছ,—বড়র সঙ্গে ছোটর তফাৎ খুব বেশি নয়। কিন্তু বন্যার জল আবাব নেমে যায়—আবার এরা যে যার স্বরূপ প্রকাশ করে। এমনি করেই চলছিল—অকস্মাৎ এলো তেরশো পঞ্চাশ সালেব মন্বন্তর।

চাল পাওয়া যায় না—ডালও তথৈবচ। কাজেই বজরা, জনার, তার সঙ্গে কচুর শাক, ওলের গোঁড়া সেদ্ধ করে চলতে লাগল আহার; কিন্তু কয়েকদিনেই ফুরুলো জনার বজরা—তখন শাক-পাতা-ডাঁটা, সঙ্গে হয়ত এক মুঠি খুদ বা এক ছটাক গমভাঙা—এর পরে শুধু ডাঁটা আর পাতা সেদ্ধ—তারপর অর্দ্ধাহার। মানে, সাধুভাষায় অর্দ্ধাহার অনেক দিন আগেই হয়েছে—এখন হোল গ্রাম্য ভাষায় অর্দ্ধাহার। অনাহার যেদিন যার ঘটল সে সেদিন জীবনের মায়া কাটালো। দলে দলে লোক পালাতে লাগল সহরে—যদি কোথাও একমুঠো খাবার পায়—। যারা পালাতে পারল না—তারা মরলো—মরবার আগেই অর্দ্ধেক হাড়-

মাংস কুকুর শেয়ালে খেল—সে এক নতুনতর দৃশ্য! সভ্য মানুষের চরম সভ্যতার নিদর্শন ট্রেণ-ষ্টিমার-প্লেন যখন যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত—তখন বাংলা দেশে ঘটে গেল এই মহামারী—। মহাকালের জয় হোক!

সবাই কিন্তু মরলো না—যারা রইলো বেঁচে তাদের মধ্যে দু' একজনের কথাই বলি। শঙ্কর বাগ্‌দী আর রাজু ডোম। অনেক কৌশল খাটিয়ে, অনেক ফিকির ফন্দী করে ওরা দুজনায় বেঁচে আছে এবং শীগ্‌গির মরবার কোনো লক্ষণ নেই। ওদের সঙ্গে বেঁচে আছে রাজুর সোমত্ত বোন ময়না। একেবারে নিরেট লোহার মত শরীর—রংটাও ফর্সা—আর বেশি লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়। ভদ্দর লোকের ঘরের একখান শাড়ী পরিয়ে দিলে কার সাধ্য বলে যে ও ডোমের বাড়ীর মেয়ে।

ময়না বেঁচে আছে—এবং তার ভাইকে বাঁচতে সাহায্য করছে। নইলে রাজু হয়ত বহুদিন আগেই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত। রাজুর আর কেউ নাই ঐ বোনটি ছাড়া। ওদের ঘর গাঁয়ের পূর্ব্ব পাড়ায় আর শঙ্করের ঘর উত্তর দিকে। গ্রামটা বেশ বড—আগেই বলেছি। কাজেই, রাজুর ঘর থেকে শঙ্করের ঘরে যাতায়াত করতে পনের ষোল মিনিট লাগে—তাও সোজা সুজি রাস্তায় গেলে—গাড়ী চলা রাস্তায় ঘুরে গেলে আরো বেশি সময় লাগবার কথা। গাড়ীচলা রাস্তায় ওরা কেউ-ই যাতায়াত করে না—সুড়ি রাস্তাটাই হিক্‌স হয়ে গেছে।

কাজকর্ম্ম রাজু যে কিছু করতে পারে না, তা নয়। কিন্তু কাজ এখন করাচ্ছে কে! আর যদি বা করায় তো মজুরী তো দেবে পয়সা! পয়সা চিবিয়ে খাওয়া যায় না। ও দিয়ে কিছু কাজ দেবে না এখন! তার চেয়ে ময়না ভালো রোজগারের পথ ধরেছে। অজয়ের ওপারে হাউই-জাহাজের ইষ্টিশান হয়েছে—নদী পেরিয়ে ও যায় সেখানে। ফিরে আসে কোনোদিন রাত বারোটায়, কোনোদিন বা আসেই না। কিন্তু চাল আনে, ময়দা আনে, চিনি, নুন, কেরসিন তেল—যা কিছু

পাওয়া যায় না গাঁয়ে, সবই আনে ময়না! বাজুর আশ্চয্য লাগে! কোথা পায ময়না এসব! মজুরীর বদলে ওবা নাকি চাল-ডাল-আটাই দেয়। খুব ভালো লোক তো ওবা! বাজুও খাটতে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু মযনা নিয়ে যায় নি। বলে,—উথেনে বিটাছেলেব কিছু কাজ নাই দাদা, বিবাক সব ম্যায়ালোক কাজ কবছে—তুমি কিসেব লেগে যাবে?

ওবা তাহলে মেযেদেব দিযেই কাজ কবায়। বান্নাবান্নাব কাজ—, ঘব দোব ঝাঁটপাট দেওয়াব কাজ, না-হয়তো ছেলেকে দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানোব কাজ—এই সবই কবায়। পুরুষদেব কাজ তো আব ওসব নয! শক্তি সামর্থ্যেব কাজগুলো কববাব জন্য পাঞ্জাবী কুলি আছে—পশ্চিমা পালোযান আছে—ওবা নিজেবাও আছে! রাজু এই সব ভেবে মন খাঁটি কবে থাকে। এ গাঁয়েব আব একটা মেযে যায ওখানে কাজ কবতে—বারুণী।

ওরা এক সঙ্গেই যায় বোজ সকালে, চপল চঞ্চল দুটী মেয়ে, দুটি ঝর্ণাধাবা যেন। গান কবতে কবতে যায়। মযনা আবম্ভ কবে:—

সুকাল বিলাব বাওড লেগে জলে জাগে ঢেউ লো—

জলে জাগে ঢেউ।

বারুণী পবেব কলিটা ধবে দেয়—

পথ আগুলে কালো ছোঁড়া—সঙ্গে যে নাই কেউ লো—

সঙ্গে যে নাই কেউ।

তাবপব দুজনে এক সঙ্গে ধবে—

কাঁখেব কলস ছল্‌কে উঠে—ছোঁড়া পাছু পাছু ছুটে,

পাছা ভাবী, চলতে নারি—একি জ্বালাব ফেউ লো—

জলে লাগে ঢেউ!

বেতের ঝোড়াটা মাথায় নিয়ে সরু আলপথে দুলতে দুলতে ওরা চলতে থাকে। এই যে কবাল ভীক্ষাহীনতাব কঠিন ভ্রূকুটি—ওরা যেন

গ্রাহ্যই করে না তাকে! ওদের উচ্ছল দেহতরঙ্গ, উদ্দাম যৌবন আর উচ্ছৃঙ্খল গান যেন জোয়ারের জোরে উজানে চলেছে! অজয়ের' বালুবেলায় নেমে বারুণী খোঁপার ভেতর থেকে বিড়ি-দেশলাই টেনে বার করে বলে—লে ময়না—ছুটান টেনে লিয়ে নদীতে নামবো।

—হুঁ—কুথাকার বিড়ি র‍্যা—মহাত্মাব মারখা?—বেশ মুটা তো, কড়া হবে?

—এক টান টেনেই ছাখ—বারুণী দেশালাই জ্বালতে যায়। নদীর খোলা হাওয়ায় দেশালাই জ্বালা সোজা নয়—একটা কাশ-ঝোপের আড়ালে গিয়ে দু'তিনটা কাঠি খরচ করে বিড়িটা ধরায় ও। তারপর ফিরে এসে ময়নার মুখে মুখে ঠেকিয়ে ওর বিড়িটা ধরিয়ে দেয়। ময়না হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে বলে—দূর থেকে লুকে মুনে করবে—চুম খেলি আমার তু।

বারুণী বলে—ধুর ছুঁড়ি! শাড়ীটো দেখতে পাবে যে লো! বিটাছেলে মনে করবে কেনে?

—করলে বেশ হোতো কিন্তুক।

—আমি বিটাছেলে হলে তুর দাদা আমার সঙ্গে আসতেই দিতো না তুখে!—বারুণী কথাটা বলে বিড়িতে টান দিল।

ময়না চুপ করে রইল একটু ক্ষণ। তারপর বলল—দাদাকে নিয়ে ভারী মুস্কিল ভাই। লিখাপড়া জানা লুক, বুঝলি, আমাকে শুধোয়, 'কি কি কাজ কত্তে হয় রে ময়না! পল্টনদের সঙ্গে কথা বলতে তুর ডর লাগে না রে? আর কোন্ কোন্ গাঁয়ের মেয়েলুক আসে উখেনে খাট্‌তে?'—এই সব শুধোয়; কি যে বলি!

—কি বলিস? বারুণী অলস ভাবে প্রশ্ন করল!

—কি আর! যখন যা মুয়ে আসে দি বলে! কি যে করি, তা তুই-ও জানিস—আমি-ও জানি!

—ভাগ্যিস এই কাজ পেইছিলুম—না-হলে মরেই যেতে হোত কবে! বেঁচে থাকলে বাপের নাম ভাই ময়না, আমরা ছুটো লুক—আমাদের অত পুণ্যগিরিতে কি কাজ! আগুতে বাঁচি—তা বই তো পুণ্যি!

—হুঁ—যা বলেছিস! ই কাজ না কল্লে আমিই বাঁচতুম, না, দাদাই বাঁচতো! থাকি চুপ করে আখুন!

—বাবাকে আমিও লুকুই সব কথা—মা কিন্তুক জানে। সিদিন কি হোল জানিস—ঘরে এসে কাপডটো ছাডছি—মা দেখতে পেল গায়ের দাগটো—হারামজাদ্দারা যা সব বজ্জাত্!—মা শুধুলো, এমনি করে দাগ করে?—আমার এমন হাঁসি লাগছিল!

—কি বললি মাকে?

—বললুল—চাল-ডাল দেয় তো! অত-সত দেখতে গেলে চলে না।

—লে চল—বিলা হইছে! আচ্ছা ভাই, ঐ আঁটকুড়োরা আমাদিগে নিয়েই ফষ্টি-নষ্টি করে—ঘব যায় না কেনে!

—ঘর আবার কুথা লো! হুঁ—তুই-ও যেমনি—উ খালভরাদের আবার ঘর!

—চ—চ—উঠ্।

—তাডাতাড়ি কেনে লো! গেলেই তো কিছু কাজ নাই!

—তা হোক! চ ভাই, ইখেনে বসতে আমার ভাল লাগছে না; দাদা আবার লদীতে হাতমুখ ধুতে আসে!

ময়না উঠে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে বারুণীও। তাড়া করবাব কোনো দরকার ছিল না—যে লোকগুলির সুনজরে ওরা আয়েসে পোষিত হচ্ছে—এক আধ ঘণ্টা দেরী হলে তারা কিছুই বলবে না। তবু ময়না তাড়া দিল—ওর দাদা এদিকে আসতে পারে; ওর বাহারে'-শাডী আর খেমটা-ধাঁচের খোঁপা দাদাকে ও দেখাতে চায় না।

ওদের দেহ-বিলাসিনী বলা চলে না—দেহ নিয়ে বিলাস করতে শেখে নি ওরা। দেহ-পসারিণী বললেও ওদের দেহটাকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হয়—। ওরা দেহোপজীবিনী। এই দেহটাই ওদের আজকার উপজীবিকা—বাঁচবার উপায়। শক্ত, সুদৃঢ় আর সুস্থ দেহটা আছে বলেই ওরা আজও খেয়ে বেঁচে রয়েছে, ওদের স্বল্পসংখ্যক আত্মীয়কেও খাওয়াতে পারছে। নদীর ওপারের বনটায় পাণ্ডবেশ্বরের মন্দির ; ঐ দিকে তাকিয়ে ওরা প্রণাম করলো। ওদের দেহটা খুব বিক্রী হয়। কত লোকের যে হোল না, তারা তো মরেই গেল না খেয়ে। ভগবান ওদের উপর সদয় আছেন। ভগবানকে ধন্যবাদ !

অজয়ের মাঝস্রোতে এখন জল হাঁটুর উপর ওঠে। পরণের শাড়ীখানা গুটিয়ে আনতে আনতে ওরা স্রোতে পা ফেলছে আস্তে। বারুণী হাসতে হাসতে বললো—অতোটো তুলিস না লো—কেউ দেখতে পাবে।

দেখুক গা—ভারী তো বয়ে যাবে—বলেই ময়না একবার পিছনপানে চাইল। তার দাদা যদি নদীতে মুখ ধুতে এসে থাকে! না, কেউ কোথাও নাই।—বাঁ দিকে রেলের পুলের উপর ঝম্‌ঝম্ শব্দ করে ভোরের ট্রেনখানা যাচ্ছে! লোকগুলো সব জানালা পথে ঝুঁকে দেখছে ওদেরকে। লজ্জায় ময়না কাপড়টা খানিক নামিয়ে দিল—ভিজে গেল নীচের দিকের শাড়ীটা!

—মর আঁটকুড়োরা—দেখতে লাজ লাগে না!

—তুরই বা লাজ কিসের অত র‍্যা! কুথাকার কে যায়, দেখুক গা-না। খামুখা কাপড়টো ভিজুলি!

—কাল থেকে ভাই, ছেঁড়া লুগা পরেই আসবো ; নদী পার হয়ে উপারে যেঁয়ে কাপড় ছাড়াবো।

—তা-বই ছেঁড়া লুগাটো রাখবি কুথা? বারুণী কৌতূহলী হাস্যে মুখের পানে চাইল ময়নার।

—কেনে, ঐ করবী গাছে মিলে দিয়ে যাব—শুকুবে। যাবার সময় নিয়ে যাব!

—বাহা! খুব বুদ্ধি! যত হা'ভেতে মড়াখেকোর দল রাখবে তুর লুগা! কাপড়ের অভাবে নাংটো বেড়াইছে যাশের লুক—তুর লুগাটিকে লিবে নাই—ঠাকুরের কাপড় বলে রেখে দিবে!

—হুঁ—নিয়েই যাব সঙ্গে তা'লে!

—ঐ ছিঁড়া টিনা! হারামজাদী কুথাকার! তাহালে ঢুকতে দিবে ঠিকেদার সায়েব?

কথাটা সত্যি! পরিষ্কার বেশভূষাব জন্যই ওদের খাতির। ওদেরকে ভদ্র মেয়ের পর্য্যায়ে ফেলা হয়েছে। ময়না উত্তর খুজে না পেযে চুপ করে রইল। বারুণী বলল—তাথেকে ঠিকেদারকে বল—আর একখানা কাপড় কিনে দিক—আমিও বলব ঘুষ-সায়েবকে! পরশু তো হাট আছে, একখানা করে কাপড আর গামছা কিনে লিব!

—হুঁ—ময়না আর কোনো উত্তব দিল না! নদীটা পার হয়ে কবরী বন! কবে কোন্ মহাপুরুষ এইখানে শ্মশান-সাধন করতেন, তিনিই জবা আর কবরীর গাছ লাগিয়েছিলেন এই নদীর কিনারে; আজ সেটা মাইল খানেক জুড়ে জঙ্গল হয়ে গেছে। ওর মাঝ দিয়ে মানুষ-চলা সুড়িরাস্তা। মানুষ ঢুকলে দূর থেকে দেখাই যায় না যে কেউ যাচ্ছে! দিনের বেলা কোনো ভয় নাই, কিন্তু রাত বেশী হলে এই যায়গাটা পেরুতে একটু ভয়ভয় করে ওদের;—ভূতের ভয়, চোরের ভয়, আর লম্পটের ভয়। যদিও লম্পটকে ভয় করা আব ওদের উচিৎ নয়—তবু ভয় করে। বারুণী বলল,

—ইখানটোকে কেটেকুটে ফেলে কেনে যে ঘর বানায় না—ডর লাগে ভাই ইখানে আমার।

—চ—চ; আমাদের আবার ডর কিসের! থুকাথুকা ফুল রইছে কেমন—লে দুচারটো!

ময়না ফুল ভালবাসে। কয়েকটা করবীগুচ্ছ ভেঙে ও খোঁপায় গুঁজলো। বারুণীও গুজলো একটা গুচ্ছ, বলল—কাল ঘুষ-সায়েব কি বলছিল জানিস? বলছিল যে যুদ্ধু থামলে আমাগে ওব ঘরকে নিয়ে যাবে—কলকাতা। উ খালভরার কথা যেন বিশ্বেস করছি আমি আর কি! যি কদিন আছিস বাবা, লে—আবার মিছ্‌কথানি কেনে!

—তু কি বল্লি?—ময়না হাসতে হাসতে শুধুলো।

—বল্লুম, হুঁ বাবু, এতো কুপাল কি আমার হবে! লিয়ে যাও তো যাব।

—আমাকেও বলছিল ঐ রকম। উসব বলে হারামজাদারা—ভুলে করে, আমরা বিশ্বেস করছি।

—কি জন্যে যে অত মিছ্‌মিছেনি কথা কয়? আবার বলে কি জানিস? পূজোর সুময় আমাগে কানের দুল কিনে দিবে আর একটো সিলিকের শাড়ী কাপড়।

—উঃ বাবা র‍্যা! বলিস কি লো! তুর কুপালে যে ঘুষ-সায়েবের রাণী হবার লিখন দেখি।

—হুঁ—দেখছিস কি! ইদিকে একটোর বেশী দুটা লুগা নাই। দেয় তো ভারী—চাল আর ডাল।

—তবু দেয়।—ময়না একটা নিশ্বাস ফেললো।—দাদাকে খাওয়াতে পারছি বারু—নাহলে দাদা ঠিক মরে যেতো। লিখাপড়া জানা মানুষ—খারাপ কাজ কর্ত্তে লারে—খারাপ কথা শুনতে লারে—দাদাকে নিয়ে যে কি মুস্কিল!

—তা বেটে ভাই। তুর দাদা আবার একটো আলাদা মানুষ। ভদ্দর লোকের ঘরে জন্ম লিলেই ভাল হোত ওর—তুখে কিন্তুক ভালোবাসে ভাই ময়না—দাদাই তুর মা-বাপ !

—বাবাকে আমার মুনেই পড়ে না, মাকে একটু আধটু। দাদাই তো আমার সব। দাদার লেগেই সুংসার—দাদার লেগেই ইসব কত্তে হচ্ছে !

করবী বনটা শেষ হয়ে গেল। ওপাসে ফাঁকা মাঠ—তার পর দেখা যাচ্ছে হাওয়া-জাহাজের মস্তবড় উঠোনটা। কোনো প্লেন উঠছে, কোনোটা এইমাত্র নেমে ধুঁকছে—ঠোঁটের পাখাটা ঘুরছে এখনো বন বন করে। দুটো উড়ে ওদের মাথার উপর দিয়েই চলে গেল সবেগে ! রেল লাইনের উঁচু আল-ধারে মানুষচলা সুড়ি রাস্তা—তাই ধরে ওরা চলতে লাগল ! যাবে ওপাশের কারখানায়।

—আর একটো চুটি খেয়ে লে—উখেনে আবার চুটি খেলে বকে—বলে —মুয়ে নাকি গন্ধ লাগে !

—সিগরেট খাস না ?—ময়না শুধুলো !

—হুঁ—কিন্তুক জলপানা লাগে সিগরেট ! উ আবার খায় নাকি ! কড়া চুটি না হলে শানায় না ভাই আমার।

বড় একটা বাব্‌লা গাছের পাত্‌লা ছায়ায় বসল দুজনে। আঁচল আড়াল দিয়ে বিড়ি ধরালো—বেশ লম্বা একটা টান দিয়ে বারুণী বলল—কাল যখন ফিরলুম না—এনেকটো রাত তো হইছিল—দেখি কি—কিষ্টে হারামজাদা বসে রইছে—মাকে বলছে, 'বারুকে উখেনে যেতে দিব না আমি—উখেনের লুকরা সব কেমন লুক, কে জানে।', মা বললে—'খাটতে না গেলে চলবে কেনে বাছা—তুমি যদি খাইতে পাত্তে, তাহলে না হয় বলতে। তুমারই এক বিলা জুটে না—বারু খাটতে যায়—দুসের খুদকুঁড়ো আনে, তাই বেঁচে আছি।' হারামজাদা

তাতে বল্লে কি জানিস! বলে, 'আমার বউ—আমি যদি না যেতে দি?'

—তু কুথা ছিলি তিখন? ময়না সাগ্রহে শুধুলো! বারুণী বলল—আমি নাছ দুয়োরেই শুনতে পেলুম কিষ্টের কথা—দাঁড়ালুম—বলছে, 'উ তো বেশ্যেগিরি করছে উথেনে—যেতে আমি দিব না।'

—উ কি করে জানলো?—ময়না যেন চমকে উঠে ভয়ে ভয়ে প্রশ্নটা করলো।

—কে জানে গা! আমি বাইরে না থেকে ঢুকলাম ঘরে—ঝুড়িটো নামাইয়ে দিয়ে বললুম—খুব বেশ্যেগিরি করবো—না করলে খাব কি রে হারামজাদা? বলে সেই 'ভাত দিবার ভাতার লয়, কিল মারবের গোসাঁই।' বেরো ঘর থেকে!

—তা বই?

—মারতে আসছে খালভরা! বলে, তুখে খুন করবো হারামজাদী! আমি না সেই মেয়ে! একটো খাজুরের ডাল নিয়ে সপাসপ্ ঘাকতক দিলুম ঠুকে! পালাবার পথ পায়না! যাবার সময় বলে গেইছে—নদীধারে আমাকে পেলে হয়—এতক্ষুণ বলি নাই ভাই—ডর লাগছিল!

—হুঁ—দাদাকেও বলে দিবে নাকি তেবে!

—দেগ্‌গো! দিলে আর কি করবি! দাদা কি আর না বুঝেছে ভাই!

—নাঃ দাদা আমর উসব খবর রাখে না। শুনলে বড্ড দুঃখু পাবে। হয়ত ঘর ছেড়ে চলেই যাবে কুনো দিকে!

—কি আর করবি ময়না! খুসীর সয়দা তো আমরা করছি না বোন! ভগবান দেখছে। পাপ আমরা করি নাই। আমাদের গতর ছিল, কাজ পেলে করতুম। কাজ কৈ! কি করবি আর?

—হুঁ—ময়না বড্ড বিমর্ষ হয়ে পড়ল!

—চ—উঠি। আজ একটুস্ সকাল সকাল বেরুস ভাই ময়না, কিষ্টেকে ডর লাগে আমার!

—ছাড়লে তো!—বলে ময়না উঠলো। মাথার চুলে গোঁজা আছে আয়না আর ছোট চিরুণী, কিন্তু প্রসাধন করতে আজ ভুলে গেল ওরা দুজনেই। বিক্রিতব্য যৌবনকে সাজিয়ে না নিয়ে গেলে ক্রেতার দল অনুযোগ করতে পারে—অবহেলা করতে পারে—দর কম দিতে পারে, জানে ওরা, তবু কারো মনেই হল না রূপসাধনার কথাটা।

লাইনের ওপাশে জোলডাঙ্গা কলিয়ারীতে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট চলছে—মজুরগুলো পথের ধারে বসে ঝিমুচ্ছে আর মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে—গান্ধীজি কি জয়—মজুরী বাড়াও—ইনকিলাব—জিন্দাবাদ!

কদিন থেকে দেখে যাচ্ছে ময়নারা—কিন্তু আজ যেন গোলমালটা বেশি। পুলিসও এসেছে, ঘোড়ায় চড়ে দারোগাই বোধ হয়। ভয়ে ভয়ে পাশ কাটিয়ে ওরা কারখানার দিকে এগুলো। খড়ের চাল দেওয়া সাময়িক সব ঘর—দেখতে খুব সুন্দর—নতুন সোণারংএর খড় চালের উপর সূর্য্যের আলোয় জ্বলছে—বেশ দেখতে লাগে। পথটা দুভাগ হয়ে গেছে এইখানে। ডান দিকে গেল ময়না আর বাঁদিকে বারুণী। ময়না খুব আস্তে হাঁটছে আর বারুণী চলছে নৃত্যছন্দে—দেখে মনে হয়—ওর যেন কোনো দুর্ভাবনাই নাই।

*　　*　　*

শাওণ মাসের আজ পনরই, আর পাঁচ-সাত দিন পরেই ঝুলনের মেলা বসবে। হুঁ—মেলা আর এ বছর বসেছে। বসাবে কে? কেই-বা দেখতে আসবে মেলা? মানুষগুলো যে রকম ভাবে মরছে—মেলা দেখবে—একেবারে শমন-সদনেই যাত্রা করছে ওরা। রাজুর হঠাৎ গানের কলি গুণগুনিয়ে উঠলো মনে—

গেলি সব শমন-সদনে—ও ভাই শমন-সদনে,
চাল না পেয়ে চলে গেলি কী অভিমানে ?   ও ভাই শমন-সদনে।
বাবুর ঘরে ছিল রে চাল—বেচে দিল পেয়ে দালাল,
গাঁয়ের লোকের চোখের উপর নিয়ে গেল চাল-ধনে—শমন-সদনে।
কেউ পেলি নে খুদের কুঁড়ো—মবলি ছেলে, মবলি বুড়ো···
যোযান মেযে খাবার চেয়ে বিচ্‌লি সতীত্ব-ধনে—সমন-সদনে।

গুণ গুণ গুণ গুণ—গানটা তৈরী হয়ে উঠলো। আবো ত্ব'একটা পরকলি লাগাতে পাবলে বেশ হয়। বাজু দেওযালে টাঙানো একতারাটা নিয়ে টুং টুং টুং-টুটুং করে বাজাতে বাজাতে মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। আরো একটা লাইন মাথায এসে গেল ওব, গাইল—

পথেব ধারে আস্তাকুড়ে—মরে তোবা বইলি পড়ে,

ওরে দেখলো না কেও···মিল আব জুটছে না মাথায। 'শমন-সদনে'র সঙ্গে মিলুতে হবে। রাজু মহা ভাবনায় পড়ে গেল। ময়না থাকলে চট্‌পট্‌ একটা জুগিযে দিতে পারতো। কিন্তু সে তো আসবে সেই রাত্তিরে। ততক্ষণ কি আব অপেক্ষা করা যায় ? বাজু অস্থির হযে মিল খুঁজছে। ওব পরিচিত শব্দের অতি ক্ষুদ্র ভাণ্ডাবটি হাতড়ে হাতড়ে ফিবছে রাজু। 'সদনে-মদনে' দিলে বেশ মিল হয়—না—'বদনে' আবো ভালো—উৎসাহিত হয়ে উঠলো··· ।

একটি ফোঁটা জলের টোপা কেউ দিলনা বদনে—
গেলি সব শমন-সদনে···টুং-টুং-টুং।

—সাঙাৎ।

—এসো, ভাই, এসো। তোমাকেই খুঁজছিলাম।

—কেনে হে ?

—গায়েন বাঁধলুম একটো। শুন তো কেমন হইছে। বলেই রাজু

সমস্ত গানটা গাইল! উৎসাহে শঙ্করও যোগ দিল ওর সঙ্গে! দুজনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইল বার তিন চার। রাজু খুব খুসী হয়ে উঠেছে, কারণ সাঙাৎও গাইছে। গানটা ভাল হয়েছে তাহলে!

—চা খাবে সাঙাৎ? খাও-না ভাই! আমি অখুনো চা খাই নাই!

—বেশ তো, বানাও! চা-চিনি সব আছে ঘরে?

—হুঁ—ময়নার দৌলুতে কিছুই অভাব নাই! কিন্তু বড্ড খাটছে ভাই মেয়েটা! সেই ভুর বেলা গেইছে—আসবে সেই রাত দুপুর করে! যোয়ান দাদা আমি—বসে বসে খাই। এত কষ্ট হয় সাঙাৎ!—হুঁ—শঙ্কর আর কিছু বলল না। রাজু কয়েকটা শুকনো তাল মোচা, পাতা, জেলে একটা মাটির ভাঁড়ে জল চড়িয়ে দিল উনুনে। চা, চিনি, চা-ছাঁকনী, দুটো এনামেলের গেলাস বার করল।

—দুধ কুথা পাবে হে সাঙাৎ? শঙ্কর প্রশ্ন করল!

—আছে! টিনের কোটোতে দুধ আছে। দাঁড়াও, দেখাইছি!—বলে রাজু একটা জমাট দুধের টিন বার করলো। তার থেকে খানিকটা দুধ একটা বাটিতে নিয়ে গরম জল অল্প মিশিয়ে নাড়া দিল একটা কাঠিতে করে—দেখছো সাঙাৎ? একদম খাঁটি গাইয়ের দুধ—শুঁকে দেখ!

—হুঁ হে! তাইতো! ময়না এনেছে?

—আর কোথা পাব নইলে? ময়নার আমি দাদা, আর দাদা কি খেতে চায়—দাদা কি ভালবাসে—দাদার কি চাই—এই সবই ওর ভাবনা! আর কিছুটি যদি ভাবে বোনটি আমার!

—হুঁ—অত কষ্ট করে মানুষ করেছ!

—কষ্ট ভগমান করেছে ভাই, আমি আর কি! তাও তো আজ আমাকেই খাওয়াইছে। নইলে তো মরেই যেতুম।

—হুঁ—শঙ্কর চুপ করে রইল। রাজুর উচ্ছ্বাস আরো খানিক

চলতো হয়ত, কিন্তু চায়ের জল ফুটে উঠেছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে চা ছেড়ে দিল! গুণগুনিয়ে গান গাইছে—

"শমন-সদনে—ও ভাই শমন-সদনে"—গায়েনটি কেমন লাগল ভাই সাঙাৎ!

—বেশক্! তেবে ঐ যে বলছো, 'যোয়ান মেয়ে খাবার চেয়ে বিচলো সতীত্ব-ধনে'—ঐটুকু খুব ভাল! আর দিনকাল যা পড়েছে ভাই, উরকম না করলেই বা কি করে আর—তাই বলছিলুম কি·····

শঙ্কর থামলো! রাজু চায়ের গেলাসটা ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল—বলো সাঙাৎ!

—হুঁ—ময়নাকে উখেনে আর যেতে দিও না তুমি। সুমত্ত মেয়ে—উখেনের লুক সব ভাল নয়!

—কেনে? কি করে জানলে? কিছু খারাপ শুনেছ নাকি?

—হুঁ—কিষ্টে কাল রেতে আমাকে বলতে এসেছিল যে উওদিকে যাওয়া বন্ধ করতে হবে! ঐ কিষ্টের বৌটাও যায় কিনা—ঐ বারুণী।

—হুঁ—হুঁ—যায়। উই তো রোজ ভোবে এসে ময়নাকে জাগায়; এক পথেই যায় তুজনায়।

—কিষ্টে বলছে যে উরা—ময়না আর বারুণী ভাল কাজ করে না; কিষ্টে খবর লিয়ে এসেছে! তোমাকে বলতে লারুছে—আমাকে যেয়ে বললে।

চায়ের গেলাসটা মুখ থেকে নামিয়ে রাজু বলল—মিছে কথা! কোথা শালা কিষ্টে?

—তোমার কাছে আসতে লারছে উ। ডর লাগে তোমাকে! তবে কথাটো মিথ্যেও লয় হে সাঙাৎ! উত্তেজনায় রাজু দাঁড়িয়ে উঠলো!

—ময়না ইরকম খারাপ কাজ করছে? কোন্ শালা বলে?—কৈ

কিষ্টে? কোথা কিষ্টে? আসুক তো শালা আমার লজরে। কেটে কুটিকুটি করবো উওকে!

রাজুর বুকের পাটা রাগে ফুলে উঠছে। শঙ্কর একটুক্ষণ থেমে বলল—বসো সাঙাৎ। অত রাগ করবের কি হোল! কিষ্টে বললেই তো আর কিছুই হবে না! আমাদের হুঁসিয়ার হ' দরকার—তাই বলছি!

হুঁ—হুঁসিয়াব। হুঁসিয়ার কি হব! ময়না আমার কোলের মেয়ে—ময়না আমার বুকজুড়োন ধন—ময়নার নামে কলংখ দেয় কোন হারামজাদা;···রাজুর বাগ পড়তে চায় না। শঙ্কর আরো খানিক চুপ্‌টি করে বসে থেকে উঠে যাচ্ছে, রাজু বলল—চললে নাকি?

—হুঁ—যাই। ময়নাকে কিছু বলো না আখুন, বুঝলে! শঙ্কর বেরিয়ে গেল মাঠের দিকে।

শঙ্করের সঙ্গে রাজুর বন্ধুত্ব অনেক দিনের। সেই যখন তারা গরুবাগালি করতো গাড্ডুটি পালে। গাঁয়ের সব লোকের গাই গরু আর বাছুর চবাতে নিয়ে যেত পালে—তারপর সন্ধ্যাবেলা ফিরে জীবন যোগীর "নাইট-ইস্কুলে" পড়তে যেত! গাঁয়ের বাবুরা করেছিল ঐ নাইট ইস্কুল—এখন আর চলেনা সে স্কুল—বছর দুই হোল বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু রাজু আর শঙ্কর পড়েছিল ঐ ইস্কুলে। পড়াশুনো করা থেকে শঙ্কর বেশি ভালবাসতো গাদাগাদি খেলা; রাজু কিন্তু সত্যি পড়তো; চার পাঁচ বছরে রাজু রামায়ণ মহাভারত পড়তে শিখেছিল—তারপর বামুনদের তারণ ঠাকুরকে বলে একখানা মনসামঙ্গল, একখানা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আর একটা বাদাবাদি তরজা কিনে আনিয়েছিল কলকাতা থেকে। ঝুলনের মেলাতে সে-বছর কিনেছে একটা 'হারু ঠাকুরের পাঁচালি'—আর গোপাল উড়ের গান। বইগুলি মহা যত্নে ন্যাকড়ার ফালিতে বন্দী হয়ে আছে। সময় পেলেই রাজু খুলে পড়ে।

তাছাড়া একটা উড্‌পেনসিলও আছে ওর। ঐ তারণ ঠাকুর দিয়েছিল। বেশ লোক তারণ ঠাকুর; রাজুর গায়েন বাঁধা শুনে খুব উৎসাহ দেয়—আর বলে—কলকাতায় নিয়ে ছাপাবে ঐ গায়েন। তা উ পারে। তারণ ঠাকুর নিজেও পত্ত ছাপায়। কতদিন আসে নাই ঘর। পূজোতে এলে একবার সব গায়েনগুলোন্ ঠাকুরকে দেখাবে রাজু! উড্‌পেনসিলে লিখে টিনেব বাক্সতে ভবে রেখেছে। আজকারটাও লিখবে ভেবে কাগজ পেন্‌সিল বার করেছিল, কিন্তু গায়েন লিখতে আর মন সরছে না। গানের রস গাঁজিয়ে উঠেছে—তাড়ির নেশা লেগেছে যেন রাজুকে। ময়না! ওব আদরের ময়না কি তাহলে সত্যিই দেহ বিক্রী করে চাল-কলাই-চিনি-আটা নিয়ে আসে? না—না—না, রাজু কিছুতে বিশ্বাস করে না এ কথা! কৈ, ময়নাকে দেখে তো সে কথা মনে হয় না! যেমন ছিল ময়না, তেমনি আছে, বরং রোগা হয়ে গেছে। একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে ময়না যায় খাট্‌তে—গায়ে একটা পেতলের গয়নাও নাই—ময়না করবে নচ্ছারী! ছিঃ! রাজু কি সব ভাবছে! হতে পারে না—হতে পারে না! রাজু বসল। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! যাকগে! চা আজ আর খেতে চায় না বাজু। না, চা খাবেনা কেন! ময়না এসে শুধুবে—চা খেয়েছিলে দাদা?—এসেই শুধুবে, আজ কি রাঁধলে দাদা? এসেই হেসে হেসে বলবে—আজকে বেশি খাটুনি ছিল না দাদা—খুব জিরিইছি। খিচুড়ি রাঁধবো—। ময়না—আমার কত কষ্টের মানুষ করা বোন ময়না—খালি দাদা, আর দাদা। দাদা ছাড়া কিছু জানে না ময়না। না—মনটাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না রাজু। যদি সত্যি হয়—। সত্যি যদি ময়না দেহ্ বিক্রী করেই চাল-ডাল-আটা সংগ্রহ করে—তাহলে, তাহলে রাজু এই কয়মাস ঐ পাপার্জিত অন্নে জীবনরক্ষা করে এসেছে! ধিক—ধিক! রাজুব অর্দ্ধশিক্ষিত—স্বপ্ন-জাগ্রত মন ধিক্কারে জ্বালাময়·

হয়ে উঠলো? বেরিয়ে পড়ল রাজু কুঁড়ে থেকে। ঘরে শিকলটা টেনে দিল, কুলুপ আর দেওয়া হল না। অথচ ঘরে অনেক মূল্যবান সম্পত্তি রয়েছে; খুবই মূল্যবান বস্তু—চাল দশ বার সের—আটা আধমণ খানেক—চিনি প্রায় তিনচার সের—যা এ গাঁয়ের কারো বাড়ীতে হয়তো পাওয়া যাবে না।

রাজু গটগট করে খানিকটা চলে গেল। কিন্তু কোথায় যাবে? কার বাড়ী যাবে রাজু? তারণ ঠাকুরের বাড়ী যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঠাকুর থাকে কলকাতায়; আসবে সেই পুজোর সময়। নাঃ, কোথাও যাবে না রাজু। গাঁয়ের লোক হয়তো ময়নার কথাটা নিয়ে জটলা পাকাচ্ছে। রাজুকে দেখলে মুখ টিপে হাসবে তারা, না-বেরুনোই ভালো। ঘরেই ফিরে এল। কয়েকটা কাঠিমুঠি জেলে আবার চায়ের জল চড়ালো।

বিশ্বাস করে না—না, রাজু কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ওকথা। ময়না কখনো খারাপ নয়—হতে পারে না।—চা তৈরী করে রাজু আস্তে খেতে লাগল। ময়না এসেই শুধুবে—চা খেইছিলে দাদা?—ভাতের কি তরকারী রেঁধেছিলে দাদা?—আরো কত কি শুধুবে, রাজু বলবে,—হুঁ খেইছি। আরো বলবে,—আর একটো ভালো গায়েন বেঁধেছি ময়না, শোন! রাজু শোনাবে—। রাজু গাইতে থাকবে; ময়না শুনবে।

"শমন-সদনে, গেল সব শমন-সদনে" গাইতে গাইতে নীচের কলিতে এসে পৌছাল রাজু—"যোয়ান মেয়ে খাবার চেয়ে বেচলি সতীত্ব-ধনে—শমন-সদনে"—চমকে উঠলো রাজু! এ কি লিখেছে সে! এ কোন সর্ব্বনাশা কথা তার গানের বাণীতে গাঁথা হয়ে গেছে! গানটা থামিয়ে রাজু আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল; যেন তারই গানের ঐ কলিটা তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মত আকাশ

থেকে নেমে তার মর্ম্মকোষে বিদ্ধ হয়ে গেছে। গানের ঐ লাইনটা যেন সত্যের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। রাজু আবার অস্থির হয়ে উঠলো। না—ঘরে থাকা অসম্ভব আর! চায়ের গেলাসটা নামিয়ে. রাজু উঠে পড়ল—দরজায় তালাচাবি দিল—তারপর গ্রাম-পথ বেয়ে চলতে লাগল। কিন্তু যাবে কোথায়? কোথায় গিয়ে শান্তি পাবে আজ রাজু? মাথাটা কেমন দপ্‌দপ করছে। ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! আশপাশের কিছুই দেখছে না রাজু, সামনেও কিছু না; শুধু ঐ কলিটা "যোয়ান মেয়ে খাবার চেয়ে বেচ্‌লি সতীত্ব-ধনে"—ডগডগে রক্তের অক্ষরে লেখা—নিজেরই লাল-নীল পেনসিলটার লেখা মোটা মোটা অক্ষর, বড় বড় অক্ষর—কাঁকড়া বিছের মত লেজ-তোলা দাঁড়াওয়ালা আখর রাজুকে দংশন করছে নিষ্করুণ ভাবে! ছুটে যদি পালাতে পারতো রাজু!

শঙ্করের ঘর যাবে? না—শঙ্কর আবার সেই কথাই বলবে। তার চেয়ে বারুণীর বাবার সঙ্গে দেখা করবে? শঙ্করদেব পাড়াতেই ঘর বারুণীর, আর কিষ্টরও ঘর ঐ কাছেই। রাজু গট্‌গট্‌ করে চলে আসছে—কে যেন ডাকলো—রাজু, ওরে ও রাজু! নাটু মোড়ল বারান্দায় তামাক খাচ্ছিল, ডাকছে রাজুকে! রাজু ছাড়িয়ে এসেছিল নাটুর বৈঠকখানা—ফিরে তাকিয়ে দেখলো—বললো—ডাকছো না কি মোড়ল?

—হ্যাঁ—আয় এখানে।

রাজু ফিরে এল। দাঁড়ালো মোড়লের সামনে। হুঁকোতে একটা সুখটান দিয়ে নাটু কলকেটা নামিয়ে দিল মাটিতে—লে, খা। যাবি কুথাকে?

কলকেটা তুলে দুটো টান দিয়ে রাজু বললো—যাব একবার বারুণীদের উদ্দিকে। কি বলছো?

—বলছিলোম কি, বুনটোকে উখেনে যেতে দিস কেনে? ওরা কি লোক ভালো? শেষ কালে দেখিস, কুনদিন বুন আর ঘরেই ফিরবে না। যেতে দিস্ না উখেনে—বুঝলি?

—গতর খাটাইয়ে খাবে—তাও তুমাদের সইছে না মোড়ল! কেনে ইসব কথা বলছো বল দেখি!

রাজু কলকেটা নামিয়ে দিল মাটিতে। নাটু বললো—গতর খাটাবার আর যায়গা নাই রে, যে ঐ সব কাজ করতে হবে? অত কষ্ট করে বুনটোকে মানুষ করলি কি ঐ কর্ম্ম করাবার লেগে! আচ্ছা আহাম্মক তু কিন্তুক রাজু!

রাজু চুপ করে রইল। রাগ তার খুবই হয়েছে কিন্তু বিষাদে সর্ব্বেন্দ্রিয় যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে! শারীরিক সমস্ত সামর্থ্য যেন লুপ্ত হয়ে গেছে ওর! নাটু আবার বলল—আমার ঘরেই পাঠিয়ে দিস কাল থেকে, বুঝলি। পাটকাজ করবে—রোজ একসের চাল আর নুন, তেল, ডাল সব আমিই দিব; উখেনে যেতে হবে না। হোক্?

—না মোড়ল—ময়নাকে যে তুমি কি চোখে দেখ, তা জানি আমি। ভালো চাও তো চুপ কর। আমার বুন। আমি তার লেগে ভাববো। তোমার অত কথায় কাজ কি—রাজু আর দাঁড়াল না—চলে গেল যেন ছুটেই। নাটু মোড়ল তার কাঁচা-পাকা দাঁড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে আপনার মনেই বলল—আচ্ছা, দেখ্ লেঙ্গা! কলকেটা তুলে নিয়ে নাটু শুঁকে দেখলো, তামাকটা পুড়ে গেছে, ডাক দিল,—ওরে হরু, কলকেটা বদল করে দে।—একটা পাকুড় গাছের পাশ থেকে বেরিয়ে এল কিষ্ট। বাব্‌রি চুল তেল না পেয়ে রুক্ষ হয়ে জট্ বেঁধে গেছে। কালো কুচকুচে দেহের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে—বেজায় রকম ঢেঙা লাগছে, যেন শুকনো প্যাকাটি। চোয়ালের দু'খানা হাড় এত উঁচু হয়ে উঠেছে যে গালের মাংস ভেতরে ঢুকে

গেছে—শুধু বড় বড় চোখ দুটো জ্বলছে, খিদেতে না হিংসায় কে জানে! মোড়ল বলল—কিষ্ট যে রে—কোথা গেইছিলি! আয়, কলকেটা সাজ দেখিনি।

কথা না কয়ে কিষ্ট কলকে সাজতে বসল। নাটুই বললো আবার, —তুর বৌটোও যায় নাকি রে উথেনে? ঐ হাউই জাহাজের কারখানায়?

—হুঁ—বলে কিষ্ট কলকের আগুনে ফুঁ দিতে লাগল। মোড়ল ওর তোবড়ানো গালের পানে চেয়ে বলল—যেতে দিস কেনে তু? তু হারামজাদার কিস্তুক আক্কেল নাই। বিয়েলি বৌ—যেতে দিবি কেনে? ময়না ছুঁড়িটোব কথা আলাদা। ওর দাদা আখুনো বিয়েই দিলে না আঠারো বছরের বুনের; কিন্তু বারুণী তুব বৌ—তু ছাড়িস কেনে? বেকুফ্ কোথাকার! নিজের বৌকে কে আবার পরের ঘরে পাঠায় র‍্যা—!

—যেতে কি আব আমি দি গুলা? ওর মা হাবামজাদি বড্ড বজ্জাৎ। বল্লেক কি, জানো, বল্লেক—খুব কববেক যাবেক! তু খালভরা প্যাটে ভাত দিতে পারিস না—খাবেক কি ব্যা-মুখপুড়া!

—কেনে? তুর রুজগারপাতি নাই কিছু?

—না! ঘর ছাইবাব আর কারো দরকার লাগে না। মরেই গেল সব। ঘর আর ছাইয়ে কি করবেক। তা বই, জনমজুরও কেউ খাটায় না—আর যদি খাটায় তো দেয় পয়সা—চাল নাই।

মোড়ল কলকেটা হুঁকোয় বসিয়ে গোটা কতক টান দিল ঘনঘন। তারপর বলল—যা দিন কাল পড়েছে কিষ্ট। চাল আর পাবি কুথা? হ্যাঁ, তবে আমি বুদ্ধি করে চাল কিছু রেখেছিলোম। বেচে দিলে টাকা পেতুম অনেককটি, কিন্তু তুবা সব না খেয়ে মরতিস? হ্যাঁ, দেখ্—শুন—একদিন অন্তর এসে একপাই করে লিস, বুঝলি—আর

আমার ঐ যে ভসকাজুড়ির ক্ষেতটা—উখেনের ক'টা আল ভেঙেছে গেল-বছর—যা, আজ থেকেই লেগে যা, কাজ করবি, খাবি। ভাবনা কি! ধান হলে আমি কিন্তুক বাবা দুটাকা সের-করা দাম ধরে তোমার ভাগের থেকে উশুল করব। ই বছর যা বর্ষা—সব তোর শোধ হয়ে যাবে—যা, লেগে যা।

কিষ্ট হাতে স্বর্গ পেল। একদিন অন্তর আধসের চাল দেবে মোড়ল! যথেষ্ট হবে দুজনের পক্ষে! ওর সঙ্গে কমলীলতা, হিঞ্চের শাক—শামুক-গুগলি-কাঁকড়া, পায় তো দুটো চুনোপুঁটি—বেশ হবে! কিষ্ট মোড়লকে প্রণাম করে বলল—রাজা তুমি বাবা। তোমার হিল্লে পেলে আর ভাবনা কি! আজই নিয়ে আসবো শালীকে!

—হুঁ, নিয়ে আয়। আমার পাঁদাড়-দিকে গোয়ালের পাশেব লাঙ্গল রাখা ঘরটায় থাকবি দুজনায়। আব দেখ—ঐ ময়না ছুঁড়ির দেমাকটো ভাংতে হবে—বুঝলি!

—হুঁ গুলা—উই হারামী তো যত লষ্টের জড। ওকে দেখেই বারুণীকে নিয়েছে ঘুষ-সায়েব—ঐ শালীই তো বজ্জাৎ বেশি? বাজু শালা বুনকে কিছু বলেও না।

—নারে—না। তুর বারুণী ছুঁড়িটোও খুব সুন্দর দেখতে। আর বয়েসটা কি! আঠার-কুড়ি, এই তো বাবা বজ্জাতি কববার সুময়। দুটোকেই, বুঝলি—টিট করা যাবে। বারুণী না গেলে ময়নাও যেতে পারবে না। একা-একা গেলেই একদিন নদীর মানাতে ধরে আচ্ছা করে—বুঝলি—! নাটু তাকালো কিষ্টের দিকে। কিষ্ট ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়েছে, বলল—ময়নাকে লিবে তুমি গুলা? উ আর কতক্ষুণের কাজ! বলতো আজকেই আমি ধরে এনে দিই?

—বলিস কিরে! আজকেই পারিস?

—খুব খুব! কলকেটো ছাড়ো গুলা আর একবার।—কিষ্ট সাহস

পেয়ে বলল কলকের কথা। নাটু কলকেটা হুঁকো থেকে নামিয়ে বলল, —সাজতো আব একবাব ভাল কবে। কিছু খাস নাই আখুনো—লয়? ওবে হরু, এক আঁচলা মুড়ি দেত বাবা কিষ্টকে—দে—।

হরু নটনাথেব বছব আটদশ বয়সেব পুত্র। মা নাই—নাটু বিপত্নীক। বাড়ীতে আছে বিধবা বোন—নাটুব ছোট। সেই সংসাব দেখা শুনা কবে। নাটুব অনেল সম্পত্তি—চোদ্দ-খানা লাঙ্গলেব চাষ—গৰু-বাছুব-মোষ-ছাগল-ভেড়ায় ঠাসা তাব গোয়াল। কিন্তু নাটুব অত্যাচাবে অতিষ্ঠ হয়ে এই সম্পন্ন গৃহস্থেব সাতাশ বছবেব বধূ হরুব মা গত বছর উদ্বন্ধনে মরেছে। নাটু সেই থেকে গাঁজা খেতে ধবেছে সন্ধ্যাবেলায় এক ছিলেম কবে। নাটুব কিছুই অভাব নাই শুধু গৃহেব লক্ষ্মীটি ছাড়া।

বাজু যেন উল্কাব মত চলেছে। নিতান্তই ছোট জাতেব ঘবে জন্মেছে রাজু, বোনেব ব্যাপাবটা ও অনায়াসেই অগ্রাহ্য করে যেতে পারতো। ওদেব সমাজে এ সব ঘটনা ঘটে থাকে আব ওবা দেখেও দেখে না, কিন্তু বাজু এক আধটু লেখাপড়া শিখেছে। নিজেকে ও অন্যেব চাইতে উচু মনে কবে, আব মনে কবে তাব বোন তারই মত হয়েছে। কাবণ বাজু বোনটাকেও কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছে নিজেই। ওদেব জাতেব কোনো মেয়েই লেখাপড়া জানে না। রাজু আশা কবে, রূপশাব দেবেন ডোমেব একমাত্র ছেলে মকব ডোমের সঙ্গে বিয়ে দেবে ময়নাব। 'মকব আব ময়না' চমৎকার মানাবে! ওদেব অবস্থা ভাল, জমিজিরাৎ কিছু আছে, তাছাড়া মকব ভাল লাঠিয়াল, রূপশার বাবুদেব বাড়ীতে পাইকেব কাজ কবে—বেশ শৌখীন ছেলে সে। বিয়েব সবই ঠিক আছে—বিয়েও হয়ে যেত

অনেকদিন—মাঝখানে গোল বাধলো ঐ মকরকে নিয়েই। রূপশার বাবুদের সঙ্গে সারসার বাবুদের দাঙ্গা বাধলো—মকর সেই দাঙ্গায় কয়েকটা লোককে জখম করে। পরে আদালতে তার দু'বছর জেল হয়। এখনো সে জেলে আছে। এই আশ্বিন মাসে খালাস পাবে;— তারপর অঘ্রাণেই বিয়ে দেবে রাজু ময়নার। দেবেন ডোম বারবার বলে পাঠায়—দেখো বাবা রাজু, ময়নাকে যেন আমার হবেই দিও। ছেলেটা এই আশ্বিনেই ফিরে আসছে!

ময়নাও জানে সব কথা। সেই ময়না অন্যায় কাজে উপার্জ্জন করে পরকালের পথ তো নষ্ট করছেই—ইহকালকেও অগ্রাহ্য করছে! মকর যদি জানতে পারে—তাহলে কি আর বিয়ের আশা থাকবে। তাছাড়া—এমন অন্যায় কাজ করতে দেবেই বা কেন রাজু। রূপশা গ্রামটা কাছেই—কোশখানেকের মধ্যে। দেবেন ডোম যে-কোনদিন শুনতে পারে ময়নার নচ্ছারির কথা। হয়তো শুনেইছে এর মধ্যে! রাজু তাহলে মুখ দেখাবে কেমন করে লোকের কাছে? বড় একটা তমাল গাছের ঘন ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো রাজু। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল— এখন রোদ ঝিকমিক করছে। জলভেজা তমালের পাতাগুলো রোদে চিক্‌চিক্ করছে! সুন্দর দেখাচ্ছে। আহা! কি সুন্দর গাছ! রাজুর গান মনে পড়ল।

—না পোড়ায়ো রাধার অঙ্গ না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরই ডালে॥

হ্যাঁ, মরলে এমন গাছে যদি কেউ দেহটা টাঙিয়ে দেয় তো সার্থক হয় মরণ। রাধার সোনার অঙ্গ এই কালো কেষ্টবরণ গাছে মানাবে ভালো। ময়নার অঙ্গটাও সোনার বরণ। ডোমের মেয়ে কে বলবে! ও তো রাধারই মত সুন্দর। গাঁয়ে ক'টা মেয়ে আছে অত সুন্দর! নাই। বোনের সমস্ত শরীরটা চোখের উপর ভেসে উঠলো। এতটুকু

একফোঁটা বোন—তাকে অতবড় করেছে রাজু! তিলতিল করে বড় করেছে—পাখি যেমন করে ডিমে তা' দেয়, ঠিক তেমনি করে। আঠারো বছরের রাজু চার বছরের বোনকে মানুষ করে আঠারো বছরের করেছে! চোদ্দ বছর ধরে রাজু ওর মা-বাপ-ভাই হয়ে আছে! ওর সাধের ময়না—ওর আদরের ময়না—ওর জীবনাধিক প্রিয় ময়না!—রাজুর নিশ্বাসটা আগুনের মত গরম।

কোথায় যাবে রাজু! কার বাড়ীতে? না, গাঁয়ের সবাই হয়তো ময়নার কথা নিয়েই কাণাকাণি কবছে আজ। সবাই অবজ্ঞা করবে রাজুকে। রাজু সইতে পারবে না। না; কোথাও যেয়ে কাজ নাই; বাড়ীতেই ফিরে যাবে রাজু। কিন্তু রাজু যেন কোথায় যাবে বলেই বেরিয়েছে? হ্যাঁ, মনে পড়ছে, বারুণীদের বাড়ী একবার যাবে, ভেবেছিল। রাজু চলতে লাগল।

অল্প কয়েক পা দূর। বারুণীর মা বেড়ায় কাপড টাঙিয়ে দিচ্ছিল শুকুতে। রাজুকে দেখে বলল—এসো রাজু—অমন উস্কো-খুস্কো—গা' ভাল আছে তো?

—হুঁ—রাজু বেড়ার মধ্যে ঢুকে উঠোনে গিয়ে বসল একটা মাচুলিতে। বারুণীর বাবা কোথায় গেছে। বারুণীর ছোট ভাইটা তালের খুঙ্গিতে কেঁচো ভর্ত্তি করছে, মাছ ধরবে। গাঁদা গাছের ঝোঁপ-গুলো আর দোপাটির জঙ্গলটার মাঝখানে একটা ডালিম গাছ। বড় বড় ডালিম ফলে রয়েছে, দু' একটা ফেটে গেছে। রাজু সেই দিকে তাকিয়ে রইল। কাপড় মেলে দিয়ে বারুণীর মা ঘরে ঢুকে বলল, —বড্ড শুকনো লাগছে যে রাজু মুখে?

রাজু চুপ করে থাকলো খানিক—তারপর বলল—বারু আর ময়নাকে নিয়ে গাঁয়ের সব শালারা কি সব বলছে, শুনছো?

—শুনবো কি আবার! অত শুনতে গেলে প্যাট চলে না বাছা।

খেতে দিবার বেলা কেউ তো নাই—কথা বলবার বেলাই আছে! যা যার খুশি বলে লিক। উসব গিরাহ্নি করিস কেনে?

—কিন্তু উসব কথা যদি সত্যি হয় তো······

—সত্যি হয়তো কি হবে! যে বাজার পড়েছে! এক গরাস খেতে পেলে বাঁচি—তা বই উসব কথা শুনবো। আমরা বাবা ছোটো লুক—আমাদের উসব শুনলে চলে না কো···হু!

—তা হলে সব সত্যি?

—কি সত্যি?

—এই সব, যা ওরা বলছে?

—সত্যি হলে কি করবো বাবা, বল। গাঁয়ের কেউ খাটালি পায় না। ময়না আর বারুণী যে পেইছে, এই কত্‌কেব। নাহলে তো না খেয়েই মরতাম আমরা। সত্যি হলেই বা করবো কি?

—তুমি জানো তা হলে!—রাজু উঠতে উঠতে বললো—পেটের মেয়েকে বেউশ্যেগিরি করতে দিলে?

—হুঁ—দিলুম। না দিলে না খেয়ে মরতে হোত। তুখেও মরতে হোত—বুঝলি? ভাগ্যিস ময়নার দেহটো সোনার আর বয়েসটো কাঁচা—নাহলে, যার যত মুরোদ, জানা গেইছে।

রাজু ওর সঙ্গে আর কথা কইল না, বেরিয়ে পড়লো। বারুণীর মা আপন মনে গজ গজ করতে লাগল—হুঁ, বলে সেই 'বিষ নাই তার কুলোপানা চক্কর।' ঐ কাজটি না পেলে তুর বুন এদ্দিন ভাগাড়ে শুকুতো। তু ছুঁড়াও যেতিস সঙ্গে। ক'বেল ছোঁড়া কুথাকার। বারুণীর মা নিজের কাজে মনোযোগ দিল। চাল উলিয়ে মুড়ি ভাজবে সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাজুর কথা একদম ভুলে গেল। রাজু কিন্তু ভোলে নাই। বারুণীর মায়ের সেই কথাটা ওর মাথার দাহ্য পদার্থে দেশলাই জ্বেলে দিয়েছে। জলন্ত শিখা মাথায় নিয়ে রাজু রাস্তায় চলেছে যেন।

তারণ ঠাকুরের ভাঙা ভিটে। গাঁয়ের মধ্যে এই একটামাত্র লোক রাজুকে ভালবাসে—রাজুকে বড় দাদার মত মানে। মনের সব দুঃখ রাজু ওর কাছে উজাড় করে দিতে পারে। কিন্তু তারণ তো বাড়ীতে নেই—আছে কলকাতায়। তবুও রাজু ঢুকে পড়ল। গরীব বামুনের সাত পুরুষের ভিটে। উঠোনে বড়-বড় ঘাস—তার মাঝে একটা পুরানো জবা গাছ আর একটা ভাঙ্গা তুলসীমঞ্চ। তুলসী গাছটা কিন্তু বেশ সতেজ আর ঝাড়ালো। মঞ্চের ছোট্ট কুলঙ্গীতে গতকাল সন্ধ্যায় জ্বালা বাসি প্রদীপটা একটা কাক খুঁটে খাবার চেষ্টা করছিল, তারণের বৌ সেটাকে তাড়াবার জন্য বাইরে আসছে—প্রদীপটা কাকে তুলে নিযে পালাতে পারে। রাজুকে দেখেই বৌটা মাথায কাপড় তুলে দিল। রাজুই কাকটাকে হাততালি দিয়ে তাড়িযে দিয়ে বলল—দিদি ঠাকরোণ কৈ বৌমা? ডুব দিতে গেইছে?

—হুঁ—ঘোমটার মধ্যে বলেই বৌ আরো ঘোমটা টান্‌লো। কালোকোলো ঢেঙা মেয়ে; দেখতে এককালে ভালো ছিল; কালো না, শ্যামলাঙ্গীই ছিল ও, কিন্তু এখন দুঃখে দৈন্যে হয়ে গেছে যেন পোড়া কাঠ। হাতে দুগাছা শাঁখা—রং উঠে সাদা হয়ে গেছে—নোয়া আছে বাঁহাতে গাছা তিনচার—ঝুন ঝুন করে তাই বাজে। পরণে আধ ময়লা কাপড়খানা খাটো, মাথায় ঘোমটা দিতে গিয়ে পিঠখানা উদোম হয়ে গেল। রাজু এর মধ্যে উঠোনে বসেছে। বৌটা সন্তর্পণে তুলসীতলায় এসে প্রদীপটা তুলে নিল—পিতলের প্রদীপ, কালো হয়ে গেছে ক'দিন মাজা হয়নি বলে। আগে নিত্যি মাজা হোত। এই দিন কতক বড্ড কষ্ট যাচ্ছে ওদের। চাল নাই, টাকাও নাই।

পরশু একবেলা জুটেছিল, কাল সন্ধ্যেতে খেয়েছে শুশ্‌নী শাক আর জনারের ছাতু—আজ এখনো উনুন ধরেনি! রাজু ঘরটার দিকে তাকিয়ে বলল—উনুন জ্বাল নাই বৌঠাকরোন, বিলা তো এনেক হোল!

—হু—জ্বালি—বৌ সরে চলে গেল ঘরের ভিতরে। রাজু বুঝলো—তারণ ঠাকুর বাড়ীতে নাই, কাজেই রান্নার তাড়া নাই। এরা হয়তো বেলা করেই রান্না চাপায়। সে উঠোনে বসে তুলসীমঞ্চের ধারে পাশের ঘাসগুলো ছিঁড়তে লাগল। যায়গাটা বড্ড জঙ্গল হয়ে রয়েছে। একটু পরিষ্কার করে দেবে—এই ইচ্ছে। ঘাসের মাঝে মাঝে দুতিনটে দুপুরে-ফুলের গাছ আপনা-আপনি গজিয়েছে। ঠিক ভর্ত্তি দুপুর বেলায় ওর লাল ফুলগুলো ফুটে যায়। এর মধ্যেই আধফোটা হয়ে এসেছে; তাহলে দুপুর হতে আর দেরী নাই। রাজু উঠোন থেকে বলল,—বিলা হোল বৌঠাকরোণ, উনুনে আগুন দাও!

বৌঠাকরোণ কোন জবাব দিল না। বৌঠাকরোণ রাজুর সঙ্গে কথা কোনো দিন বলে না—ঐ হুঁ—হ্যাঁ—এর বেশি নয়। কাজেই রাজু নিশ্চিন্ত মনে ঘাস ছিঁড়ছে। উনুন না-ধরাবার কারণটা ও আন্দাজই করতে চাইছে না। আবার খানিক পরে বলল—

—ঠাকুরের চিঠি আসে নাই বৌঠাকরোণ?

কোন জবাব পাওয়া গেল না। রাজু উঁকি দিয়ে ঘরের মেঝেতে তাকালো—ছেঁড়া আঁচলটা বিছিয়ে বৌটা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। হোল কি? অসুখ করেছে নাকি! ভাবছে রাজু—ইতিমধ্যে দিদি এসে পড়ল। তারণ ঠাকুরের দিদি—বিধবা, ঠাকুরের থেকে বছর আষ্টেকের বড়; মা-বাবা মারা যাবার পর দিদিই সংসারের কর্ত্রী। চান করে এসেছে—ছেঁড়া কাপড়টা নিংড়ে মেলে দিতে দিতে বলল,—রাজু যে রে, কতক্ষণ এলি?

—এই আসছি দিদি ঠাকরোণ—তা বৌঠাকরোণ শুয়ে কেনে?

—কে জানে, দেখি। গাঁয়ে কোথাও চাল পেলুম না রাজু, কিনতেও পেলুম না!—দিদি ছেঁড়া কাপড়খানা লোহার তারে শুকুতে দিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করল।

—চাল তো আছে আমার ঘরে চাট্টি—বেশি লয়, সের পাঁচ-ছয়—দিব এনে ?

—তু কুথা চাল পেলি ? ও, ময়না পায় বুঝি উখেনে ?

—হু—রাজু জবাব দিল, কিন্তু মনে লাগল ধাক্কা একটা। ময়না চাল পায়। পায় আরো অনেককিছু। কেমন করে পায়, তা এই দিদিঠাকরোণ নিশ্চয় জানে না।

—চিঠিপত্তর কিছুই পাই নাই রাজু। টাকাপয়সা কিছু হাতে নাই। বড্ড মুস্কিলে পড়েছি !

—ও ! চিঠি আসবে। দাদাঠাকুর হয়ত সুময় করতে পাবে নাই—রাজু বলল—যা খাটুনি ঠাকুরের !

—কে জানে ! কি হোল বৌ ? পেটবেদনা ?

—হুঁ—বউটা আরো ভালো করে শুলো ! কাল থেকে ও খালি জল খেয়ে আছে। পেটে আব কাঁহাতক বেদনা না করে ! বাইশ বছরের বৌটাকে দেখতে লাগে যেন বিয়াল্লিশ বছরের। ছেলেপিলের কোনো বালাই নাই। ভাগ্যিস নাই—থাকলে খাওয়াতো কি ! ভগবানের দয়া ! ঈশ্বর ওকে বাঁজা করে দিয়েছেন !

রাজু ঘাস ছেঁড়া বন্ধ করে বলল—ঠাকুর টাকা পাঠায় নাই, দিদি ঠাকরোণ ?

—না রে—আজ কুড়ি দিন চিঠি নাই, টাকা না হয় ঝক্ মারলো—ভুলেই গেইছে হয়ত !

—না দিদিঠাকরোণ, ভুলবের লুক লয় দাদাঠাকুব। টাকা পায় নাই হয়তো ! আচ্ছা, আমি চাল কটা ঝট্ করে লিয়ে আসি ! উনুনটো ধরাও তুমি ! আমি আজ এইখানেই পেসাদ পাব—রাজু উঠে চলে গেল।

হয়তো একমুঠো জুটতেও পারে ঐ রাজুর দয়ায়। উনুনটা ধরাবে

নাকি! রাজু যদি চাল না আনে! থাক, রাজু চাল আনুক—তারপর না হয় উনুন ধরানো যাবে। দিদি চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেই রইল। বৌটা ঘরের ভেতর কাতরাচ্ছে। বেদনাটা হয়ত খুব জোরালো হয়েছে ওর, দিদি কী করতে পারে! ঘটিবাটি যা ছিল সব বাঁধা দিয়েছে, না হয় বেচে ফেলেছে—এখন যা আছে তার দাম হয় না। তবু সকাল থেকে দু'আনা পয়সার জন্যে চেষ্টার ক্রটি করে নি। নাঃ, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না! রাজু যদি চাল আনে তো ধরাবে উনুন—না আনলে আর কি জন্যে ধরাবে? দিদি বাইরে থেকেই বলল—জলটা খেতে যে মানা করলুম রে হারামজাদী, খেলি কেনে! বৌ চুপচাপ। সাত চড়ে ওর রা বেরয় না! আপনার দুর্ভাগ্য আর দুঃখের চাপে ও আত্মসমাহিতা হয়ে গেছে। ময়লা বালিশটা পেটে ঠেসে দিয়ে আরো ভাল করে শুলো।

বসে থাকা চলে না—দিদি উঠলো। রাগে-অভিমানে চোখে জল আসছে দিদির। রাগ আর অভিমান করবার একমাত্র পাত্র, ভাইটি—ঐ তারণ ঠাকুর। নিজের মনেই বলল—যত জ্বালা হইছে আমার! দিব্যি কলকাতার নিমতলায় বাবু বসে আছে—আর আমি আখুন মরি ওর বৌকে নিয়ে। নিয়ে যাক—নিয়ে যাক এসে। আমার আর সামর্থ্য নাই!

দিদি উঠে উনুনে কয়েকটা শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন ধরালো। জল চড়িয়ে দিল খানিকটা, তারপর কি দেবে, ঠিক করতে পারছে না। দেবার মত নাই কিছুই—!

দিদিঠাকরোণ—রাজু ডাক দিল এসে—স্কাল থেকে চা খাই নাই দিদিঠাকরোণ—টুক্‌চেক বানাও তো, খাই!

সের তিনেক চাল, সের খানেক ডাল, একটা ঠোঙায় সের খানেক চিনি—কিছু চা, একটিন জমাট দুধ, রাজু একটা ঝুড়িতে ভরে নিয়ে এসেছে—নামিয়ে দিল।

দিদি ডাকল,—উঠো তো বৌ—উঠো, চা খাও দেখি একটুকু—দেখ, পেট-বেদনা ভাল হবে! ই দুধ তো আমি ছোঁব না—তুমরা খাও। লাও, উঠো।

শুয়ে-শুয়েই বৌটা দেখলো জিনিষগুলো। গরম চা একটু খেতে পেলে হয়তো ওর পেটব্যথা ভাল হতে পারে। কিন্তু উঠতে পারছে না—বড্ড দুর্ব্বল লাগছে। দিদি বলল—জল ফুটছে—উঠো!

বৌ উঠল—টিনটা কাটবো কি দিয়ে?

সুপারী কাটা জাতি দিয়েই কেটে ফেলল শেষটায়। দিদিকে দুধ-না-দেওয়া লাল চা একটু বেশি চিনি দিয়ে তৈরী করে এগিয়ে দিল,—তারপর ঐ জমাট দুধ দিয়ে অন্য একটা পাত্রে খানিকটা চা তৈরী করে রাজুকে অর্দ্ধেক দিয়ে বাকিটা খেতে আরম্ভ করলো। বেশ লাগছে। গরম গরম চা—খালি পেটে হলইবা—দুধ তো আছে, হোক না জমাট দুধ—বেশ লাগছে!

দিদি ভাতের জল চাপিয়ে দিল উনুনে। রাজু বলল—আলু আর কাঁচকলাও আছে দিদিঠাকরোণ—লিয়ে আসি। ও আবার বেরিয়ে গেল। দিদি বৌটাকে বলল—কে কখন কি ভাবে উপ্‌গার করে, দেখ। খোকাকে কত বকতুম রাজুকে অত আস্কারা দেবার জন্যে। আজ কিন্তুক রাজুই দিলো একমুঠো চাল।

বৌ তখন চাল ধুয়ে হাঁড়িতে ছাড়বার উপক্রম করছে—চুপ করে রইল। কথা প্রায় কয় না—কথা না কইতে হলেই ও যেন ভাল থাকে। দিদি কিন্তু আবার বলল—আজ যদি খোকার চিঠি না পাই, তাহলে মাথা খুঁড়ে মরবো আমি। আমি আর পারবো না—পারবো না এমন করে। গাঁয়ের অর্দ্ধেক লুক মরে গেল। খবরের কাগজে চাকরী করিস—খবর তো দিব্যি পাস—কুন নিশ্চিন্দি বসে আছিস?

—টাকা পায় নাই হয়ত—বৌ অতিশয় ভয়ে ভয়ে বলল।

—পায় নাই তার আমি কি করবো! কি থইব তুদিকে—লাজ লাগে না ছোঁড়ার।

ভাইএর উপর বোনের এই ক্রুদ্ধ গর্জ্জন পনেরো বছর ধরে শুনে আসছে বৌ। ও জানে এই ভাইবোনের মান-অভিমানের কথা। চুপ করে বসে উনুনে জাল ঠেলে দিতে লাগল।

—তু' হারামজাদী একটো চিঠি লিখ দেখি। লিখ, যে আমরা না খেতে পেয়ে মরে গেলুম—লিখ আজ!

—তুমি তো লিখছোই। আমি লিখ্‌লে বেশি কি কাজ হবে আর?—বৌ একটা ছুঁচসুতো নিয়ে দিদির ছেঁড়া কাপড়টা শেলাই করতে বসে গেল। আনমনে কাজ করলে ওর ব্যথাটা কম লাগছে!

—রাজু এলে তরকারি দুটো বানিয়ে দিয়ে যাই একবার ডাকঘর। দেখি, আমার কি জুড়োবার যো আছে!

বৌ চুপচাপ শেলাই করে চলছে। রাজুর কিন্তু আসতে দেরী হচ্ছে—না আসে তো না আসুক—চাল তো পেয়েছে। শুধু ভাতই একমুঠো খাব। চল্লুম আমি।—দিদি উঠে ডাকঘর চলে গেল ভাইএর কোনো চিঠিপত্র এসেছে কিনা দেখতে।

বৌ শেলাই করছে আর ভাবছে, কুড়ি দিন চিঠি নাই—শরীর ভাল থাকলে হয়। বেঁচে তো আছি আমরা এখনো—এসে যেন দেখতে পায়—! বৌটার যেন কান্না পাচ্ছে! শ্বশুর-শাশুড়ী মারা যাবার পর থেকে ও একটা দিনও স্বাচ্ছল্য পায় নি। দুঃখ-অভাব-অনটন—এই ওর কপালের লিখন! ওর একমাত্র সান্ত্বনা, ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে—আর সেই ভালবাসাটুকুর জন্যে ও এত দুঃখ নির্ব্বিচারে নিঃশব্দে সয়ে আসছে এতো দিন ধরে। স্বামী টাকা পেলে নিশ্চয় পাঠাতো—পায়নি—তাই পাঠাতে পারে নি—এই ওর বিশ্বাস। স্বামীর শরীর ভালো থাকার জন্যই তাই ওর যত চিন্তা। ও নিজে

একেবারে লেখাপড়া জানে না—নইলে হয়ত নিজেই লিখতো একখানা পোস্টকার্ড। , পরকে দিয়ে নিজেদের না-খেয়ে-থাকার কথা লেখাতে ওর মন যায় না। কেন যে ও লেখাপড়া শেখেনি! কতবার ওর স্বামী চেষ্টা করেছিল শেখাতে। তখন যদি শিখে নিত! দুঃখ হয় এখন—কান্না পায়!

—দিদি কৈ বৌঠাকরোণ! এই শোল মাছ একটো পেয়ে গেলুম পলুই চেপে! লাও, রাঁধো দেখিনি!

রাজু একটা বড়মত শোল মাছ উঠানে ফেলে দিল আঁচল থেকে। মাছটা লাফাচ্ছে ঘাসের জঙ্গলে। আলু আর কলার চুপড়িটা দাওয়ায় নামিয়ে রাজু বলল—বঁটিটো দাও বৌঠাকরোণ—মাছটো বুনাই! আমড়া গুটাকইক হলে বেশ টক্ হোত বৌঠাকরোণ—আনবো নাকি কিষ্টের ঘরে যেঁয়ে!

—থাক্‌গে—তেঁতুল আছে। বলে বৌ আঁশবঁটিটা বার করে উঠোনে ফেলে দিলে। রাজু মাছটা কুটতে আরম্ভ করলো। উনুনের জ্বালটা ঠেলে দিয়ে বৌটা আলুকলাগুলো কুটবে কিনা ভাবছে—দিদি ফিরে এল; হাতে একখানা বই—এই লাও গো, লাও; চিঠি নাই, পত্ত নাই, টাকা তো নাই-ই; এই লাও, বই লাও, ধুয়ে ধুয়ে জল খাও!—দিদি খুঁটি ঠেশ দিয়ে বসে পড়ল। কোনোকিছুতে ওর আর মন নাই। রাজু মাছ কুটতে কুটতে বলল—দাদাঠাকুরের বই? কি বই? ডাকে এলো নাকি দিদিঠাকরোণ?

—হুঁ! ঐ বই-ই আসে। তাও যদি জানতুম, বই লিখছে, টাকাও আসছে—তাও বা হোত। উ সব করে কি যে হয়?

—আহা-হা! তুমাব ই কথা বলা ঠিক লয় দিদি। গাঁয়ের লুক না বুঝুক—তুমার বুঝা উচিত।—রাজু মাছ কুটে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে এসে বইটা খুললো। তারণ ঠাকুরের লেখা নতুন বই—"কদম ফুল"—

পড়তে লাগল রাজু। সব বুঝতে পারছে না—তবু পড়ছে। রান্না হল—দিদি খেল—বৌ ভাত বেড়ে দিল রাজুকে। রাজু বই পড়ছে।

—ও রাজু খেয়ে লে। তু যে দেখছি খোকার বড় দাদা হলি। খেয়ে নিয়ে পড়বি—ওঠ। দিদি বলল।

দিদির তিরস্কারে রাজু চান না করেই খেতে বসল। খেয়ে ঐ চালার এক পাশে শুয়ে বইটি বুকের উপর চাপিয়ে আবার পড়তে লাগল। বৌ ঘরের ভেতর শুয়েছে—দিদি বাইরে চালায় সপ্ পেতে শুয়ে আছে। রাজু একধারে শুয়ে বই পড়ছে। পৃথিবীর কোনো ভাগ্যবান সাহিত্যিক রাজুর মত এমন একনিষ্ঠ পাঠক পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

* * *

রাজু বই পড়ছে তন্ময় হয়ে। তারুণ ঠাকুরের লেখা "কদম ফুল"। বইটার মধ্যে ডুবে গেছে রাজু। বিশ্বসংসারের কিছুই ওর মনে নাই। ময়না—ময়নার কথাও না। সবকিছু ভুলে রাজু পড়ছে—"ঘন শ্রাবণের ধারায় ধারায় ফুটছে অজস্র কদম ফুল—বাদলের ঝাপটায় ঝরছে তাদের পাঁপড়ি—গাছের ডালে ফুলগুলো গোল পাথরের নুড়ির মত ঝুলছে—আর এই বিরাট সহরের বুকে ঠিক অমনি ফুলের বীথিকার মত মরণের বীথিকায় মরছে অজস্র, অগুণ্‌তি মানুষ—পার্কের কোণায়, ডাস্টবীনের কিনারায়—ড্রেণের পাশে সারি সারি পড়ে আছে মৃত্যুমলিন মানুষের কঙ্কাল। ক্ষুধিত কুকুর ওদের মাংস খেতে ভয় করে—ভাবে, কঙ্কালটা কুকুরকেই বা কামড়ে দেবে! বৃষ্টির ঝাপটাকে উপেক্ষা করে, বাদলের সৃষ্টি-শক্তির আবেদনকে অগ্রাহ্য করে যারা সহরের

আবর্জনা কুড়ুতে এসেছিল—তারা বেশ আরামের মৃত্যু বরণ করে নিল শান-বাঁধান ফুটপাতে। ওদের দিকে যারা চেয়ে দেখলো তারা, 'আহা' বলবার অবকাশ পেল না—কারণ, তাদেরও সময় সন্নিকট হয়ে আসছে।

ঐ মরণের বীথিকাতেই আবার জীবনের জয়গান। একটা অল্পবয়সী চাষার মেয়ে রাতদুপুরে একটা মেয়ে প্রসব করলো শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কোণায়। তার গর্ভের রস-রক্তগুলো চর্ব্বণ করবার লোভে দুটো কুকুর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে! জ্যান্তই খেয়ে ফেলবে হয়ত বাচ্চাটাকে। রুগ্না মা শীর্ণ হাত দিয়ে তাড়াতে পারছে না কুকুরগুলো,—কিন্তু জীবন কোথাও পরাজিত হয়নি। সমস্ত দুর্য্যোগ আচ্ছন্ন করে ঐ সদ্যজাত শিশুটাই চীৎকার করে উঠলো—টু—য়াঁ—টু—য়াঁ! ভূতের আনুনাসিক আওয়াজের চেয়েও ভয়ঙ্কর সেই কান্না—কুকুর দুটো ছুটে পালিয়ে গেল!—ওপাশ থেকে একটা বুড়ি আসতে আসতে বলল,—কি ছাওয়াল র‍্যা—বিঠি হোল?

—হুঁ—বলে ঐ শীর্ণ হাতদুটো চেপে ধরলো শিশুকে। ঝর ঝর ঝরছে শ্রাবণের বারিধারা—ঝর ঝর ঝরছে পার্কের কোণার কদম গাছের ফুলরেণু, আর ঝর ঝর ঝরছে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের চোখের জল!—ভগবানের জয় হোক—আমরা ভাগ্যবান—এই জীবনেই দুটো মহাযুদ্ধ—আর একটা মহামন্বন্তর দেখে নিলাম! দেখে নিলাম—খিদের জ্বালায় মানুষ কেমন করে মানুষের মাংস খায়—কেমন করে জ্যান্ত মানুষকে কুকুর শেয়ালে ছেঁড়ে, কেমন করে···হ্যাঁ—আরো অনেক বেশি দেখলাম আমরা—দেখবেন নাকি? দেখুন—ঐ বুড়িটা সদ্য প্রসূতি ঐ চাষার মেয়েটার মা। দেশের ঘরে খেতে না পেয়ে গর্ভিণী মেয়েকে নিয়ে সহরে এসেছিল। মেয়ের স্বামী কোথায় পালিয়েছে, কে জানে? বুড়ি শিশুটিকে তার আঁচলের খুঁট দিয়ে মুছে সাফ্

করলো—ওর মা'র মাইদুধ দু'এক ফোটা যদি থাকে তো খাওয়াবার চেষ্টা করলো—নাই! প্রসূতি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে শান-বাঁধান ফুটপাতের উপর। ওর ছোট বোনটা—বয়স বছর সতের-আঠারো, পার্কের রেলিংএ ঠেশ দিয়ে ঝিমুচ্ছিল। বয়সের গুণে এখনো দেখতে মন্দ নাই সে—বুকের কাঁচুলিটা অর্দ্ধ-আবৃত করে এই গভীর রাত্রে বসে আছে—যদি কারো নজরে পড়ে এই আশায়। নাঃ, নজর কারো পড়ছে না। অথচ দিদিকে একছটাক দুধ খাওয়ানোর দরকার। উঠলো মেয়েটা। বুড়ি বলল—চল্লি কুথাকে?

—দেখি একটুকুন দুধ যদি পাই!

গলির মোড়ের ক্ষীরের দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করতে যাচ্ছে—মেয়েটা এসে বলল—দুধ দিবে গো একটুকুন!

—বেরো—যা নোংরা কাপড় হারামজাদীর!

—দুধ টুকচেক দাও—দিদিকে খাইয়ে ভাল কাপড় পরে আসছি

মিথ্যে বললো মেয়েটা, কাপড় ওর নাই কিন্তু।

দোকানী একটা মাটির ভাঁড়ে এক ভাঁড় দুধ দিয়ে বলল—চট করে আসবি। কথা না কয়েই চলে গেল মেয়েটা। চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল—পরণে সেই ছেঁড়া ময়লা কাপড়। দোকানী রেগে বলল—বেরো হারামজাদী! কাপড়ের গন্ধে ভূত পালাচ্ছে!

—কাপড় যে নাই বাবু! বলে মেয়েটা করুণ চোখে তাকালো দোকানীর পানে।

—নাই! কেতাথ করেছ!—বলে দোকানী ওকে দিল একখানা বড় রঙিন গামছা। মেয়েটা সেই আধো-অন্ধকারে ফুটপাথে ওর ছেঁড়া শাড়িটা ছেড়ে পুটলি করে ফেললো। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের কোটরে সেদাকে গুঁজে দিয়ে ঢুকলো গিয়ে দোকানীর ঘরে। সুপুষ্ট সুন্দর যৌবন—দীর্ঘ অনাহারেও জীবনের আর যৌবনের জয় ঘোষণা করছে।

ভেতরের বিদ্যুতের আলোতে ওর শ্যামলাঙ্গ ঝলমল করে উঠলো। ক্ষীরওয়ালা ওর দিকে তাকিয়ে নিমেষহারা। মেয়েটা বলল—কিছু তো খাই নাই আজ—এক গেলাস জল দিবে তো?

মুগ্ধ দোকানী একটা পাতার ঠোঙায় দিল কয়েকটা সন্দেশ, খানিকটা রাবড়ী, এক গ্লাস জল। অত ও খেতে পারবে না—বলল,—মা আর দিদিকে দিয়ে আসি গা।

—নাঃ, তুই আর যেতে পাবি না। খা তুই, আমি দিয়ে আসছি!

দোকানিটার সম্মুখে এমন বারনারীর মত বসে থাকতে ওর লজ্জা করছিল খুবই—কারণ ও সত্যি তো আর নির্লজ্জা নাগরিকা নয়—সরমকুণ্ঠিতা পল্লীবালা ও।

গ্রহের ফেরে আজ নাগরিকা সেজেছে।—কিন্তু খিদে পেয়েছে ভয়ঙ্কর, দোকানী চলে যেতেই ও একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিল। শুকনো গলা দিয়ে ঐ ছানার ছাতু গলছে না—আটকে যাচ্ছে। এক ঢোক জল খেতে যাবে—দোকানী ফিরে এল—দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে তাকালো মেয়েটার দিকে। নির্লজ্জ, নিঃসঙ্কোচ চাওনি—ক্রীত দ্রব্যের উপর ক্রেতার দরদী পরখ! খাদ্যের উপর খাদকের লোলুপ দৃষ্টি! মেয়েটা হাঁটুতুটো, জড় করে কুঁকড়ে গেল। এ-আর-পির ভয়ে বিজলী বাতি ঘোমটা ঢাকা থাকে—দোকানী বাতির ঘোমটাটি টেনে খুলে দিল—একশ' বাতিব আলো ঠিকরে পড়ছে মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গে, কোথাও এতটুকু লজ্জা লুকোবার জায়গা নাই—সবনিগু'ণ্ঠ নিরাবরণ—নির্ম্মম নির্লজ্জতা!

—আলোটা নিবিয়ে দাও কেনে গো?—মেয়েটা ভয়ে ভয়ে বলল।

—না; দেখবো না তোকে?—বা রে!—খা, খেয়ে নে চট্ করে।

আর কথা চলে না। ক্রীত দ্রব্যকে ক্রেতা দেখতে চায়। দ্রব্যের কিছু বলবার অধিকার নাই। মেয়েটা কিন্তু খেতে পারছে না। পিছন

ফিরে বসতে গেল। দোকানী ও:কে ঘুরিয়ে একেবারে সটান দাঁড় করিয়ে দিল—ইঃ, লজ্জাবতী আমার! দাঁড়া ভাল হয়ে!

একেবারে' আলোর সম্মুখে—স্পষ্ট দুটো ক্ষুধিত চোখের বিদ্ধদৃষ্টির বক্তাক্ততায় ওর অন্তর আলুণ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু ক্রেতার তা দেখলে চলে না। মেয়েটা কিন্তু খেতে পারছে না? মুখ থেকে সন্দেশের ছানাটা পড়ে যাবে ওর! পেটে ক্ষিদে হাতে খাবার—কিন্তু সামনে ওকেই খাবার জন্য হিংস্র দানব দাঁড়িয়ে! আশ্চর্য্য কৌতুক বিধাতার! ওর রূপের শিখা দুর্ব্বল হয়ে গেছে—কাঁপছে কদম-কেশরের মত—ভীরু দীপশিখার মত।—ক্ষীর-ননীপুষ্ট দোকানীটা ওকে সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল—খাচ্ছিস না যে?

—হুঁ—ওর নগ্ন কণ্ঠস্বর নির্লজ্জ হতে পারছে না।

বাইরে কারা যাচ্ছে—পায়ের জুতোর ভারী আওয়াজ। পুলিস না কি! দোকানী আলোটা চট্ করে নিবিয়ে দিয়ে দরজার ফাঁকে উঁকি দিল। মেয়েটা এর মধ্যে সন্দেশটা খেয়ে জলের গ্লাসটা হাতড়াচ্ছে। পুলিশ নয়—দুটি ছোক্‌রা—হয়ত থিয়েটার ফেরৎ!

—"তরুর একটা নাচের দাম লাখ টাকা—চমৎকার মাইরী!"

—"হ্যাঁ—আর গলাটাও কী মিষ্টি—কাদের মেয়ে রে?—ভদ্দলোকের মেয়ে?

—"হ্যাঁ রে—বি, এ পড়ে? আজকাল তো ভদ্দলোকেরাই চ্যারিটি শো করে!"

—"ওঃ, আচ্ছা—ওর মা-বাপ এ্যালাও করে তো!"

—"নিশ্চয়! বাপ হয়তো সঙ্গে করে নিয়েই যায়—করবে আর কি ভাই! যা বাজার! চালের মণ ৪০৲ টাকা। খেতে তো হবে! কাজেই···বুঝলি?"

—"হুঁ······"

ওরা চলে গেল নেবুতলার দিকে। দোকানী আলোটা জ্বালিয়ে দেখলো, মেয়েটা জলের গ্লাস খুঁজে না পেয়ে ক্ষীরের কড়াটায় হাত ডুবিয়ে ফেলেছে।

—কি করলি হারামজাদী—দিলি নষ্ট করে ক্ষীরটা? দশটা টাকার জিনিষ!

ভয়ে মেয়েটা কেঁপে উঠলো। দশ টাকা! সর্ব্বনাশ করেছে যে সে। যদি দোকানী চেয়ে বসে দশ টাকা! কাঁপতে কাঁপতে বললো, —দেখতে পাই নাই!

—দেখতে পাও নি! এখন কে দেবে এর দাম? রোজ একটাকা হিসেবে দশ দিনে শোধ করতে হবে—বুঝলি?

হুঁ—মেয়েটা ওদিকে গিয়ে জলের গেলাসটার দিকে হাত বাড়ালো।

—তুই খা—খেয়ে হাতের ক্ষীরটা ধো। আমি দুটো পান নিয়ে আসি মোড় থেকে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মেয়েটা আরো একটা সন্দেশ খেল—জল খেল। তার পর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল, কোথাও একটু শোবার মত যায়গা যদি পায়।

চৌকী রয়েছে একটা। কিন্তু দোকানী যদি আবার বকাবকি করে ওখানে শুলে—তাই বসেই রইল। দোকানী ফিরছে না। বাইরে সে তালা দিয়ে গেছে; মেয়েটার বেরিয়ে পালিয়ে যাবার উপায় নাই। বসেই রইল; কিন্তু ঘুম আসছে। ঐ খানেই শুয়ে পড়ল শেষটায় মেঝেতে।

দোকানীটা ফিরছে। সদ্যজাত শিশুটাকে একটা গ্যাসপোস্টের কাছে সাজিয়ে রেখে বুড়ি কান্না জুড়েছে—দে বাবা দুটো পয়সা; দা-ও বাবা একটুকু ফ্যান—মেয়েটা মরে গেল বাবা গো··· !

ঐ শিশুটা ওকে ভিক্ষা পেতে সাহায্য করবে এবার। ছেলেটাকে দেখিয়ে বুড়ি, পথচারীদের দয়া আকর্ষণ করবে। হাসলো দোকানীটা। তাকিয়ে দেখলো—ওর মা খানিকটা দূরে সেই কদমগাছটার তলায় মরার মত শুয়ে আছে। গলিতে গলিতে ভিক্ষুকদের চিৎকার উঠছে—'দাও মা একবাটি ফ্যান—দাও বাবা দুটি পয়সা !'

তামার এক-পয়সা পাওয়া যায় না আজকাল। যারা কালেভদ্রে একটা পয়সা দান করতো তারা ডবল পয়সা দিতে চায় না। আধ-পয়সাও নাই বাজারে। দিতে হলে দুটো পয়সাই দিতে হয়—অতএব কিছু না দেওয়াই ভাল ! দাতারা হাত গুটিয়েছে।

রাত অনেকখানা—দোকানী ফিরে এসে দেখলো, মেয়েটা ঘুমিয়ে গেছে। দূরে ঐ বৈঠকখানার মোড়ে গিয়েছিল সে চরস-ভরা বিড়ি কিনতে। মৌজ ভাল হয়। দেবী হয়ে গেছে একটু তাই। ডাক দিল —"এই ছুঁড়ি, ও্।‌ ঘুমুলি যে বড় ?"—সাড়া নাই। ঘুমকাতর দেহখানা গামছাঢাকা পড়ে আছে। বেড়ালের ইদুর ধরার মতন ওর একখানা হাত ধরে দোকানী সটান বসিয়ে দিল ওকে ঝাঁকি দিয়ে, —"ওঠ হারামজাদী—ঘুমুবার লেগে তোকে ডাকা হয়েছে, না !"

মেয়েটার বড় বড় চোখ দুটো খুলেই আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাগে দোকানী ওর গালের মাংসটা ধরে মুচড়ে দিল—'উ-উঃ বাবাগো ! ছাড়ো-ছাড়ো !'

ওর দেহকে ও বিক্রী করে দিয়েছে আজকার মতন—কিম্বা বন্ধক দিয়েছে।

শাঁখ বাজলো কোথায় ? কে আবার জন্মালো ? ঐ ভিখারিণী মেয়েটা জন্মেছে খানিক আগে—এখন আবার কোন্ বড়লোকের বাড়ীতে এল কোন্ নবজাতক ! তাকে শঙ্খধ্বনি দিয়ে আবাহন জানানো

হচ্ছে। মরণের বীথিকায় জীবনের সেই চিরন্তন জয়গান! বন্যা-মহামারী, দুর্ভিক্ষ-রাষ্ট্রবিপ্লব, ভূমিকম্প-উল্কাপাত সব ছাপিয়ে জীবনের জয়গান বাজে—তাই জীবন অবিনশ্বর! আজকার রাতের অন্ধকার গর্ভে আগামী প্রভাতের ভ্রূণ রয়েছে। শ্রাবণরাত্রির এই দশ ঘণ্টার দীর্ঘ সাধনা আগামী কালের দৃপ্ত দিবার জন্মদানের জন্যই ;—কিন্তু কে এসব অনুভব করবে? কে, কে!

কোথায় সেই কবি—সেই সাহিত্য-শিল্পী, যিনি আজ রাত্রের অন্ধকারকে রূপ দিয়ে যাবেন ভাষায়—লিখে রেখে যাবেন আগুনের অক্ষরে। এই মৃত্যু-ইতিহাসের এই ক্ষুধালেখ। শুনিয়ে যাবেন আগামী-কালের আগমনী-সঙ্গীত—কোথায়, কোথায় তিনি, জীবনের জয়গানে যাঁর কাব্য জাগ্রত থাকবে—জাগ্রত করবে মহাভারতকে—মহামানবকে —মহান সত্য-সূর্য্যকে!

দুপাশের ফুঠপাতে মরণের বীথিকা সাজানো। জীবনের মূল্য আজ লঙ্গরখানার দু'আনা পয়সায় এসে নেমেছে—না, তার থেকেও নীচে—চেয়ে-পাওয়া একবাটি ফেনের ফেনায়। কিন্তু আশ্চর্য্য! ঐ পার্কেই আজ বিকেলে একটা বিরাট জনসভা হয়ে গেছে সাহস্কারে বক্তারা বলেছে—"ওদের বাঁচাতে হবে—ওদের যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে—আমরা চল্লিশ কোটি ভারতবাসী আছি—ভয় নাই—ভয় নাই"—ইত্যাদি। বিস্তর চীৎকার আর হাততালি পড়েছিল তখন। খদ্দরের চাদর উড়িয়ে চোখের চশমা মুছে মাইক্রোফোনের সুউচ্চ কণ্ঠে ওরা শুনিয়ে গেছে অভয়বাণী—জীবনের ঐ দেবতারা, ঐ জননায়কেরা, ঐ জন্ম-অভিজাতরা! ওদের জয় হোক! ওরা চেষ্টা করছে। ওরা দুর্গত-জনের দুঃখ নিবারণের জন্য "চ্যারিটি শো" করছে, চাঁদা আদায় করছে—চাল-ডাল-নটেশাক-বাজরা ঘেঁটে ওল-কচু-কলা দিয়ে ভিটামিন-খাদ্য তৈরী করে দিয়েছে—যা খেলে তক্ষুণি বমি হয়ে যাবে, আর না

হয়তো পেটে চড়া পড়ে যাবে—তারপর ভেদবমি হবে; তারপর যা হবার—হবে মরণ! না-না, ওরা বাঁচাচ্ছেও! ওদের হিতাকাঙ্ক্ষাটাকে বিদ্রূপ করতে নাই—করা পাপ—কিন্তু, ওরা বুঝলো না কেন যে ওদেরই মধ্যে কারো কারো লোভ—ওদেরই লোলুপতা এই বিরাট দেশটার খাদ্য সব গোলাজাত করে রেখে দিয়েছে। ওরাই ষাট টাকা মণ চাল বিক্রী করছে আর সেই বিপুল লভ্যাংশের যৎকিঞ্চিৎ খরচ করছে চাঁদা দিয়ে, লঙ্গরখানা খুলে! শতকরা আশী জনের মৃত্যু ঘটিয়ে ওরা পনের জনকে আধমরা করছে—পাঁচজনকে বাঁচিয়ে তুলে বলছে—ওরা মহাপুণ্যের কাজ করল। ওরা সেই চালের গোলাগুলো ভেঙে দিতে পারে না—খুলে দিতে পারে না? না, পারে না; ওরাই যে সব খাবে! —ঐ বড় বড় পেটওয়ালা মোটরচাপা বাবুরা তা নইলে খাবে কি? ওদের বড় পেট অ-ভর—গরীবের ক্ষুদকুঁড়োতেও ভাগ বসায়। এবার আর ভাগ নয়—সবটাই নিয়েছে! নিক্—বেঁচে থাক ওদেরও এবার শ্রমিকের কাজ করতে হবে—নইলে করবে কে আর? যাদের শ্রমে এতকাল পায়ের উপর পা দিয়ে ওরা সরু বালাম চাল আর সোনামুগের ডাল খেয়ে এসেছে, তারা আজ শুকিয়ে মরলো। ক্ষেতে তারা রেখে এসেছে সোনার ফসল—কচি ধান—কাঁচা মুগ,—কচি কচি লাউকুমড়ো—আলু-বেগুন-পটল! ওরা গিয়ে তুলবে আর খাবে। তুলতে পারবে তো? আহা! ওদের অভ্যাস নাই। গাছ ছিঁড়ে না যায়!

বৃষ্টি এল—শাওন মেঘের একটানা ঝমঝম্। যে যেখানে পারে আশ্রয় নিয়েছে; আর নাই আশ্রয়। কাছের ঐ বাফেলওয়ালটার মধ্যে লোক ঠাসা। কোথায় যাবে এই সদ্যপ্রসূতি? বুড়ি উঠলো একটু আচ্ছাদনের জন্য। কচি মেয়েটা কঁকিয়ে উঠছে! ওর মাকে একটা কিছু উপায় করতেই হবে! বুড়ি অনেকটা দূরে চলে গেছে! নতুন-মা হামা

দিয়ে পেটের ছেঁড়া কাপড়টুকু খুলছে। টুংটুংটুং—রিকসা গাড়ীর আওয়াজ। মলিন গ্যাসের আলোতে দেখা গেল, সুবেশা একটা মেয়েকে কোলে জড়িয়ে একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া যাচ্ছে রিকসাতে। গায়ে বর্ষাতি—মেয়েটায় গায়ে বস্ত্রের অনাবশ্যক প্রচুর্য্য। চলে গেল রিকসা! নতুন-মা ন্যাংটা হয়ে পরণের কাপড়টা খুলে খুকীকে ঢাকা দিল—তারপর নিজে হাঁটু গেড়ে ওর উপর ঢাকা হয়ে রইল! ওর মেয়ে; নিজে মরে গিয়েও মেয়েটাকে ও বাঁচাবে। মহাকাল প্রহরা দিচ্ছে ওদের। ওরা এখনো বাঁচতে চায় বাঁচাতে চায়, আত্মজদের—আপনার জনদের! বর্ষাধারায় ওদের জীবনের জয়গান চলছে! সদ্যজাত শিশুকে আচ্ছাদিত করে উলঙ্গ নূতন মা জাগে! কড়কড় করে বজ্র-বিদ্যুৎ ওদের কটাক্ষে দেখে চীৎকার করে উঠলো—"জয় হোক—তোদের অপরাজেয় জীবনের জয় হোক!"

*　　　*　　　*

উঃ—মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে নিল রাজু। কী ভয়ঙ্কর! রাজু যেন সইতে পারছে না।

—উঠলি রাজু! বাপ্‌রে বাপ্! চল্ উঠ—বিলা গেল যে রে!—দিদি ডাক দিল।

—হুঁ—উঠি! কি চমৎকার বই যে নিখেছে দিদিঠাকরোণ—উঃ! হু! নিখা যদি পড়তে হয় তো এই নিখা। কিন্তু শ্যাষ হোল না দিদি—!

—ঐ তাল বাগড়োটো কেটে দে দিকিনি। জল গরম করি—চা খাব! তা-বই পড়িস বসে-বসে।

রাজু উঠলো। বঁটি দিয়ে শুকনো একটা তাল-বাগড়ো কেটে খণ্ড খণ্ড করে দিল। সেগুলো উনুনের কাছে ফেলে দিয়ে রাজু ভাবছে, বইটা শেষ পর্য্যন্ত এখনি পড়বে কিনা। কিন্তু পড়ার আর ফুরসৎ হোল না। দিদি বলল—ময়না আসে কখন রে?

—রাত হয়। কুনো দিন তুফর রাত হয়, কুনো দিন বা আরো বেশি।

—ইকা আসে নাকি?

—না! ঐ বারুণী—উও যায় যে!

—ও—দিদি উনুনে জাল ঠেলে দিল। সন্ধ্যার দেরী নাই। বৌটা উঠে কাপড় কাচতে যাবার উপক্রম করছে। গামছাটা টেনে নিয়ে উঠানে নামলো। দিদি বলল—গরম চা একটুস খেয়েই যাও··· ।

—এসে খাব—বৌ চলে গেল পুকুরে। দিদি চা তৈরি করছে। রাজু কিন্তু আবার ময়নার কথাই ভাবছে। ঐ ক্ষীরের দোকানী আর সেই ভিখারী মেয়েটার কথার সঙ্গে ময়নার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে ওর মগজে। ময়নাই যেন ঐ ক্ষীরের দোকানীর ঘরে। হ্যাঁ, ময়নাই তো। এমন কত ময়না—কত সহস্র ময়না—কত লক্ষ লক্ষ ময়না আর বারুণী তলিয়ে গেল—মিলিয়ে গেল! রাজুর বোন ময়নাই শুধু নয়—আরো অনেক লোকের বোন, বৌ, মেয়ে। যাক্! রাজু যেন সমুদ্রে কূল পাচ্ছে! ওর উষ্ণ মস্তিষ্কটা ঠাণ্ডা হাওয়া পাচ্ছে একটু! ময়নাই শুধু নয়—আরো অনেকেই তাহলে গেছে। গানটা আবার মনে পড়ছে। শুনাবে তারণ ঠাকুরকে—শুনাবে—"গাঁয়ের মেয়ে খাবার চেয়ে বিচলি সতীত্ব-ধনে—শমন-সদনে"—

ওর শ্রদ্ধা জাগছে নিজের উপর। ও মা লিখেছে সেটা সত্যি—নিষ্করুণ সত্যি। আর তারণ ঠাকুর বলে—'সত্যই ধর্ম—সত্যের

উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। লেখককে সবার আগে সত্যের পূজারী হতে হবে। সাহিত্য সত্য হলে তবেই আবার সবাই হবে সত্যশীল, সত্যব্রত, তবেই ফিরে আসবে সত্যযুগ!'

তাবণ ঠাকুরের ভাষাটা রাজু ঠিকমত আয়ত্ত কবতে পাবে না,—কিন্তু ভাবটি ঠিক বুঝতে পাবে—নিজেও চেষ্টা কবে ঐ রকম ভাষায় বলবাব—কিন্তু পেরে ওঠে না। তাবণ ঠাকুরের মুখের ভাষা রাজুব বেদবাক্য। সেই তারণ ঠাকুব লিখেছে—"ভিখিবী নয়, গাঁয়েব একটা মেয়ে সহরে এসে জাত দিল—কুল-মান সবই দিল, কি জন্য? না, এক মুঠো খাবারের লেগে।"

সিপ্ সিপ্ কবে চা খেতে খেতে রাজু ভাবছে, ভাবছে—ময়নাও জাত দিল; দিক্—দিলেই আর কবছে কি বাজু! না খেয়ে তো মারাই যেত এ্যাদ্দিনে। ময়না তবু বাঁচিয়ে রেখেছে। কত মেয়েই তো জাত দিচ্ছে এই আকালেব বাজারে। মযনাও দিল। দিকগে। বাজুব মনটা সহনশীল হয়ে আসছে। কত ভদ্রলোকেব মেয়ে—কত বড বড় লোকের ঝি-বৌ—না, নাঃ বডলোকেবা কেন যাবে ওসব করতে! চাল যাদের নাই—খাবার যাবা যোগাড কবতে পাবে না—তাবাই যায়। যেতে বাধ্য হয়!

—চল্লুম দিদি-ঠাকরোণ—বাজু বইটা বগলে নিয়ে উঠলো।

—চল্লি! যা—কাল একবার আসিস—দিদি উত্তর দিযে দেখলো, রাজু বইখানা নিয়ে যাচ্ছে। কিছুই বলল না। বই ও নেয় প্রায়ই, তাছাড়া আজ যা উপকার করেছে রাজু! দিদি সম্মতি দিল। বাইরে বেরিয়ে রাজু ভাবল—যাবে কোন দিকে। বাডী ফিবে যেতে মন চায় না। একটু পচাই মদ গিলে আসবে নাকি? না, তার থেকে শঙ্করের ঘর গেলে টুকচেক তাড়ি পাওয়া যাবে। সেই ভাল!

শঙ্করের ঘরটাও কাছেই। রাজু চললো সেই দিকে। শঙ্কর মস্ত

একটা গুণী লোক বলে খ্যাত। ওর বাড়ীতে মা-মনসার পূজো তো আছেই ; তাছাড়া ও আবার তুটো ভূত পোষে। শ্যাম রায় আর কালো রায় সেই ভূত তুটোর নাম। গাঁয়ের মুচি-ডোম-বাউরী-বাগদীদের মধ্যে যার যত রকম অসুখ-বিসুখ হয়—সবাই ঐ শঙ্করের বাড়ীতেই এসে ধর্ণা দেয়। শঙ্কর মন্তর পড়ে—ঝাড়ফুক্ করে—চিম্‌টে বাগিয়ে নানান্ রকম অঙ্গভঙ্গী করে' অসুখ ভাল করে দেয়। ভালো অবশ্য সবাই হয় না—এমন কি, ভালো যারা হয় তারা আপনা আপনিই হয়—তবু শঙ্করের উপর অগাধ ওদের বিশ্বাস। শঙ্করের ঘরে তাই সকাল-সন্ধ্যা ভিড় লেগেই আছে। তুপুর রাতে শঙ্কর নাকি ঠাকুর পুকুরের পাড়ে পবন রায়ের বেলতলায় যায়। সেইখানেই থাকে কালো রায় আর শ্যাম রায়—তাদের পূজো করে' গভীর রাত্রে ফিরে আসে শঙ্কর। সে-সময় ওর মাথায় নাকি রণ চাপে—মানে, ওর সামনে কেউ পড়লে তার নাকি মৃত্যু অবধারিত। ঘরে ওর বৌ জবা ততক্ষণ বসে বসে ঝিমোয়। কিন্তু ঘুমুতে পারে না। শঙ্করকে ওর বড্ড ভয়। শঙ্কর না জানি কি মন্ত্রের জোরে ওকে কোনো দিন ভেড়াই-বা করে দেয়। শঙ্করের ভয়ে বৌটা ইচ্ছে সত্ত্বেও কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। কারণ, ওর বিশ্বাস—শঙ্কর মন্ত্রের জোরে সব কিছুই জানতে পারবে। সেই শঙ্কর রাজুর বন্ধু। আজকের বন্ধু নয়—বহু দিনের। ছেলেবেলায় জীবন যুগীর পাঠশালার বন্ধু, বড়-বাগানের গরুর পালের বাথানে, পার্ব্বতী পুকুরে চুরি করে মাছ ধরার সময়, আর লুকিয়ে পচাই মদ খাবার জন্য ক্ষেতের ধান চুরি করবার দিনের সাঙাৎ ওর শঙ্কর। তার বাড়ী রাজু যখন-তখন যেতে পারে।

শঙ্কর মনসা-ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিল। রাজুকে দেখে বলল, —এসো সাঙাৎ।—রাজু বিনা বাক্যব্যয়ে বসল। কলকেটা তুলে নিয়ে

টানতে ল্যাগল। দুটো মেয়ে, একটা আধ-বুড়ি আর একটা কমবয়সী, শঙ্করকে বলছে—তুমি যদি ভাল না কববে তাহলে যাব কুথাকে?

—তার আমি কি জানি! স্থাখ্ দেখিনি বাবু। আমি উঁসব কত্তে পারবো না বলেছি তো!

—কেনে?

—এনেক খবচা! তিনটি গণ্ডা টাকাব কমতি লয। পাব তো লিয়ে এসো গা—যাও।

—অত কুথা পাব শঙ্কর-মামা? কম বযসী মেযেটা বলল—এই সাত টাকা লাও—আর নাই!

—হবেক না—হবেক না! শ্যাম বায, কালো রায আমাব বাবা লয়। বুঝলি, পূজো না করলে ঘাড আমাব মট্‌কে দিবেক—জানিস্। একটো পাঁঠাব দাম পাঁচ-ছ টাকা। হয় কি কবে!

—আর তিন টাকা দিব। লাও ধবো। তাই কানেব ফুল বিচতে হোল!

—আনো গাঁ যাও। লিযে এস আবো তিন টাকা—তা বই দেখছি, কদ্দুর কি হয়!

রাজু বিশেষ কিছুই বুঝলো না। সাতটা টাকা শঙ্কবেব পায়ের কাছে বেখে ওরা চলে গেল। যাবাব সময আবাব বলে গেল—আখুনি আস্‌ছি। বুঝলে শঙ্কবমামা?

—কি বেটে হে সাঙাৎ? কিসেব লেগে এত ধড়-পাকড কচ্ছে?

—আর বল কেনে! যত সব অঘটন ঘটছে আজকাল। ঈশ্‌নেকে ভূতে পেয়েছে, শাঁকচিন্নীতে। এতকাল তো মেয়ে লুককেই ভূতে পেত্ত বাবা—আজকাল আবার বিটাছেলেকেও ভুত লাগল!

—কুথা হে? কুন ভূত?

—ঐ—যে। লদীর উখেনে শিমূল গাছের কাছে, শরমানার ধারে—ঐখানে বাহ্যে করতে গেইছিল। ধরেছে অমনি! তুমি শালা ভূতের আস্তানায় যেতে গেলে কেন! দেখ আখুন ঠেলা!

—কি করছে কি?

—করবেক কি আবার? যা করে! লুক চিনতে পারছে না। যাকে যা খুসী গালমুন্দ দিচ্ছে—এই সব!

—ছাড়াতে পারবে তো?

…হুঁঃ কি তুমি বলছো সাঙাৎ! আমার কাছে শাঁকচিন্নী! হুঁঃ, কত শালার বাঘাভূত ভাগাইয়ে দিলুম।

তাড়ির ভাঁড়টা উঠানেই রয়েছে—ভর্ত্তি। এখনো শঙ্করের সেবা হয় নাই। রাজু আড় চোখে একবার তাকালো সেই দিকে, বলল, —আজই লাগবে নাকি তাহলে?

—হুঁ! কি আর করি! 'দাও মামা—ছাড়ায়ে দাও মামা'—দেখছো না—কি রকম কাঁদছে ছুঁড়ি। ওর চোদ্দপুরুষের মামা যেন আমি! হুঁ! বেকলে পড়লে সুবাই মামা বলে! টাকা না আনলে হাত লাগাচ্ছি না বাবা—সি যাই বল—মামাই বল, আর মাসীই বল! এসো, দুটো প্যাজবড়া আছে—তাই দিয়েই হোক।

দুই বন্ধু কয়েক মিনিটেই তাড়িটুকু শেষ করে দিল। রাজুই খেল বেশি। ইতিমধ্যে ঈশানের বৌ আর মা ফিরে এসে আরো তিনটি টাকা দিল শঙ্করকে।

—আচ্ছা, যা—হবেক, হবেক! আজ রাত্তিতেই দিচ্ছি টিট্ করে দেখি কেমন শাঁকচিন্নী।—শঙ্কর বলল।

মনসা-ঘরে প্রণাম করে শঙ্করকেও প্রণাম করলো ওরা। তারপর সজল চোখে চলে গেল। শঙ্কর বলল—আমাকে তো ইবারে যেতে হবেক সাঙাৎ। পবন রায়ের তলায় যাব!

—যাও—রাজু উঠলো। ঘরেই ফিরে যাবে সে এবার। ঈশানকে ভূতে পেয়েছে! বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল রাজুর। ঈশান ওর কেউ নয়—তবে ছোঁড়াটা ভাল। বেশ গলা ওর। রাজুর অনেক গান একতারায় সে গাইতে পারে। আর অনেক গ্রাম্য ছড়া ওর মুখস্থ আছে। যদি না সারে ঈশান তো দুঃখের কথা। একবার দেখে গেলে হয়! ঈশানের বাড়ীর দিকেই চলল রাজু। বেশি দূর নয়। গিযে দেখল, ঘরে উঠোনো একটা গরু বাঁধবার খুঁটো—তাতে গরুর যে দড়িটা রয়েছে, সেইটে নিজের গলায় বেঁধে ঈশান চেঁচাচ্ছে—খড় দিলি না হারামজাদি—আমিও দুধ দিব না! দুধ দিব না! খোল দে, জল দে—কাঁচা কাঁচা ঘাস দে—দে শালিবা মাড দে—দিবিনা টে?

ও বাবা, এতো শাঁকচিরুণী নয়, এযে গোভূত! বাজুকে দেখেই ঈশান বলল—কে! কে রে হারামখোব! দেখে যা—দেখ, আমাব দুবে[illegible] বাঁট দেখ। দিব না—দুধ দিব না। ঐ ভাতারখাকীকে দিব না দুধ। আমাকে খেতে দেয় না! খড দেয না, খোল দেয় না, ভূষি দেয় না!

ঈশানকে তাহলে গোভূতে পেয়েছে! রাজু আর এগুলো না। রুগ্ন শীর্ণ ঈশান—দুই দিনের মধ্যেই মরবে নিশ্চয়। গাই-গরুটা দিন কয়েক আগে বিক্রী হয়ে গেছে। তাকে বেচে ফিরে আসার সময়ই এই কাণ্ড। ওর মা দাওয়াতে বসে কাঁদছে। আর বৌটা গেছে জল আনতে কাছের ঐ ডোবাতে। রাজু বলল—সাঙাৎ ভাল করে দিবে—ভাবছো কেনে তুমি! তেবে ইনি গোভূত লয় তো? রাম রাম!

—খবরদার—খবরদার! তু শালা, কুন শালা ওঝা র‍্যা শালা? খবরদার···ঈশান চেঁচিয়ে উঠলো। ঠিক গরুর শিং নাড়ার মতন ভঙ্গী করে তেড়ে এল রাজুকে। রাজুরও তখন কিঞ্চিৎ নেশা জমেছে। বলল—চুপ কর ঈশ্‌নে। পাঁচনের বাড়ীতে তুমার গোভূতের গুষ্টির ছাদ্ধ করবো—জানিস্!

ঈশান নিজেকে গরুর মতই বেঁধে রেখেছে খুঁটোয়। কাজেই গরুর দড়ি-ছেঁড়ার মত ভঙ্গিতে লাফাতে লাগল, আর গালাগালি দিতে লাগল। ওর মা বলল—কি করবো বাবা রাজু? ভাল কি আব হবেক বাছা?

—হুঁ—হুঁ, ভাল হবে না তো কি আবার!

ঈশানের বৌ ফিরে এল। গাঁয়েরই মেয়ে। রাজু ভালই চেনে তাকে—বলল—তু একটুস যত্ন কর গুলাপী, বুঝলি? যা, দড়া খুলে ঘরে লিয়ে যা।

—আমাকে তো তুচোখে দেখতেই লারছে! মারতে আসছে, দেখ-না রাজু দাদা!

সত্যি! গোলাপীকে দেখে ঈশান আরো চেঁচাতে লাগলো। গালাগালিগুলো অশ্রাব্য একেবারে। গোলাপীর চরিত্রের উপর কদর্য্য কলঙ্ক বর্ষিত হচ্ছে। ওর মা রাজুকে বললো—ই ব্যামো কি আর ভাল হয় রাজু? হে মা কালী, কি কল্লি মা!

বুড়ী ভীষণ চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিল অকস্মাৎ। গোলাপী জলের কলসী নিয়ে—মর মুখপুড়া, মর—বলে কুঁড়েতে গিয়ে ঢুকলো। রাজু আর কিছু না বলে চলেই এল বাইরে। তখনো গোলাপীর চীৎকার শোনা যাচ্ছে—কদর্য্য অশ্লীল কথা—"ভাত দিবার মুরোদ নাই ভাতার হবার আশ্।"

রাজু আর শুনতে চাইল না। তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে আসছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে—পথ অন্ধকার। হঠাৎ ওর গা-লাগবার আশঙ্কায় কে একটা মেয়ে পাশকেটে দাঁড়াল। নাটকরঞ্জার জঙ্গল ওখানটায়। কাঁটাঝোপ—বাসকলতার গাছ—তারই কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো মেয়েটা—কে? কে যায়?

—আমি—বলে উত্তর দিল যে, রাজু তাকে চেনে। বোরেগীদের

কুন্তিবালা। যাচ্ছে নিশ্চয় গুপী-রক্ষিতের বাড়ী। রক্ষিতের রক্ষিতা ও,—জানে গাঁয়ের সবাই। রক্ষিত জাতে তাঁতি। এই স্তোর আক্রা বাজারেও আধ-হাত চওড়া কস্তাপাড় কাপড় কুন্তিকে ও পরিয়ে রেখেছে। গুপীর নিজের হাতে বোনা কাপড। আঁলটা প্রায় তার দুহাত। অন্ধকার, তাই রাজু দেখতে পেল না—কিন্তু ওকে দেখেছে গাঁয়ের সবাই। রাজু বলল—কুন্ত দিদি নাকি? কুথা যাবে গো?

—যাব—চল—রাস্তা দে। কুন্তি পাশ কেটে চলে যেতে চাইছে। রাজু সুড়ি পথ আগলে বল—ক'টাকা করে দেয়? নাকি চাল দেয়?

—কি দরকার তুব সি খবরে! ছাড়—পথ ছাড রাজু! দেরী হয়ে গেল!

—ও বাবা গো! চল্লি তো আসনাই করতে, তার আবার দেরী! চল, আমার কাছে চল্—দু'সের চাল দিব—অড়হর ডাল—চিনিও দিব—চল দেখিনি!

অন্ধকারে কুন্তির আবছা মূর্ত্তিটা রাজুর উষ্ণ মস্তিষ্কে কেমন যেন বিভ্রমের সৃষ্টি করছে। সম্মুখে তার লাবণ্যবতী তরুণী, রাজুর আকাঙ্ক্ষা তার দিকে অকস্মাৎ কেমন মত্ত আবেগে প্রসারিত হয়ে যেতে চায়। রাজু হাত বাড়িয়ে দিল কুন্তির দিকে। ত্বরিতে আরো খানিকটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কুন্তি বলিল—আস্পর্দ্ধা! রেজো!

—আরে থাম্ বিটি, থাম্। তুখে আর অজানা নাই কারু! ধুমকাচ্ছিস্ কেনে! আয়!

রাজু সত্যিই ধরে ফেলল কুন্তিতে দুহাত দিয়ে। লঘু নারী-দেহ, অতি ক্ষুদ্র রাজুর সবল বাহুর কাছে! কুন্তি চেঁচিয়ে উঠতে পারে। আর চেঁচালেই কাছের পোদ্দার বাড়ী থেকে লোক বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু আশ্চর্য্য! কুন্তি চেঁচাল না! পড়ে যাবার ভয়েই রাজুর গলাটা যেন ধরেছে, ঠিক এমনি ভঙ্গিতে আঁকড়ে রইল। রাজু হনহন করে খানিকটা এসে ওকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলল—আয়, চলে আয়!

সত্যি আসছে। সত্যিই আসছে কুন্তি! বৈষ্ণব ঘরের সোমত্ত, সুন্দর মেয়ে—আসছে! রাজুর অবাক লাগল। কিন্তু ওর হাত ধরে এগিয়েই আনছে রাজু। বেশি দূর নয়—ঘরের কাছে এসে পড়েছে। পাড়ার যে কটা মানুষ এখনো বেঁচে আছে তাদের কারো কোন সাড়া পাওয়া যায় না। রাজু দরজা খুললো। কুন্তি ঢুকেই বলল—কৈ চাল?

—আছে। কিন্তু আগুতেই চাল দিব নাকি তুখে! বাঃ! বেশ তো মাইরী!

—না, আগুতে কেনে! দিবি তো? চাল কুথা পেলি রাজু? ময়না এনেছে! লয়? আমাদের আজ চার-পাঁচ দিন ভাত হয় নাই! ছুটো ভাইটো ভাত-ভাত করে আধ মরা হয়ে গেল! চল রাজু—যা করবি কর তা' পরে দে চাটি চাল! ময়না এসে পড়বেক না তো? ময়না এত চাল কুথা পায় রাজু? আমাকে সঙ্গে লিয়ে যেতে বলিস কেম্নে?

রাজু লণ্ঠন জ্বালছিল! জ্বালা হয়ে গেছে। সেই আলোতে দেখলো কুন্তির মুখ। অনাহারে শীর্ণ, তবু সুন্দর। হ্যাঁ—ময়নার থেকে সুন্দর। চাটি চালের জন্য এসেছে রাজুর কাছে আত্মবিক্রয় করতে। শুধু মুঠো কয়েক চাল, আর কিছু নয়!

—ময়না আবার এসে পড়তে পারে রাজু!

হ্যাঁ, ময়না এসে পড়তে পারে। না, ময়না এখন আসবে না। অনেক রাত হয় তার। রাত হয় এই চাল সংগ্রহ করবার জন্যই। ওর বিক্রীত দেহের মূল্য সেই চাল কয়সের!

—তুই কুথাকে গেইছিলি রাজু উদিকে?—কুন্তি প্রশ্ন করলো। রাজুর ধ্যান ভা লো যেন, বলল—ঈশানকে ভূতে পেয়েছে, তাই দেখতে গেইছিলাম!

—ভূতে পেয়েছে—হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ—কুন্তি ভৌতিক হাসি হেসে উঠলো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, বিষঢালা হাসি—বিশ্বেস কল্লি তুই বাজু? ভূতে পেয়েছে, বিশ্বেস কল্লি?—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! আবাব হাসি।

—হুঁ—কেনে?—নির্ব্বোধেব মত তাকালো বাজু কুন্তিব মুখেব দিকে। বহস্যময়ী কুন্তি হাসছে। বলল—ভূতে পেয়েছে! গোভূত লয়, শাঁকচিরুণী লয়, মোড়লভূত! নাটু মোড়ল ছিল গোলাপীব ঘবে—বুঝলি—সেব পাঁচেক চাল দিয়ে ঢুকেছিল। গাইগরুটা বেচে যখন ঈশান এল ঘবকে—তখন নাটুকে দেখে ফেলেছে! একটো অাঁশবটি নিযে নাটুকে কাটতে গেইছিল ঈশনে—নাটু আব গোলাপী ঈশনেকে ধবে ঐ গরুবাঁধা দড়িতে বেঁধে বেখেছিল, 'শালা গরু—আজ এইখানে বাঁধা থাক'—বুঝলি বাজু—সেই থেকে গোভূতে পেয়েছে! গোভূত লয়, মোড়লভূত!

হাঁ কবে বাজু তাকিয়ে ছিল কুন্তিব দিকে। কুন্তিব হাসিব শব্দে চমক ভাঙতে বলল—কিন্তুক ঈশ্নেব মা যে কাঁদছে! বলছে, ভূতে পেয়েছে ঈশনেকে!

—বলবে কি আব! বুড়ি জানে সবটাই।

—শঙ্কবের কাছে টাকা দিযে এল ভূত ছাড়াবাব জন্যে।

—অমন দেয়। টাকা ঐ নাটুই দিয়েছে। লোকদেখানো চিকিচ্ছে। ঈশনে আর ই জন্মে ভাল হয়েছে—হুঁ! দে, আমাকে চাল দিবি কি না বল দেখি।—রাজু ঈশানের ব্যাপাবটা বুঝবার চেষ্টা কবছে। হ্যাঁ, কুন্তিব কথাই তা হলে সত্যি! ভূত নয়—ভূত হতে পাবে না। স্ত্রীব চরিত্র-পতন ঈশানকে ভূতে পাওয়াব মূল।

—কতখুন দাঁড়াবো রাজু?

—হুঁ—দিই!—রাজু সের দুই চাল, দু'আঁজ্লা ডাল আর গোটাচারেক

আলু ঢেলে দিল কুন্তিব আঁচলে। বলল—যাও, শীগ্গির চলে যাও!

বিস্মিত কুন্তি বলল—চলে যাব?

—হুঁ—হুঁ—যাও! মনে রেখো, আমি তারণ ঠাকুরের সাগরেদ্। ই সব কুকাজ আমি করি না!

রাজু ঠেলে বার করে দিল কুন্তিকে; তারপর ভেতর থেকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চ্যাটাইটার উপর বসে পড়ল। কুন্তিব মুখখানা মনে পড়ছে। সুন্দর সুশ্রী যৌবনলাবণ্য ভরা মুখ। রাজুর মত ছোট জাতের ঘরে ও এসেছিল—এই এখনি। রাজু তাকে বার করে দিয়েছে। নিষ্কলঙ্ক রেখেই বার করে দিয়েছে। না—কুন্তি তো কলঙ্কিনীই। রাজু নিজেই নিষ্কলঙ্ক থাকতে পেরেছে। ভগবান ওকে সামলে দিলেন! জয় হোক ভগবানের! রাজু দেওয়ালে টাঙানো জগন্নাথের পটের পানে চাইল—তারপর কালীঘাটের কালীর দিকে, তারপর তারণ ঠাকুরেব ফটোর দিকে! তারণ ঠাকুর ওর পানে যেন চেয়ে আছে। যেন বলছে—তুই কবি—তুই পল্লীর স্বভাবকবি। তুই দেখে যা—দেখে নে এই বিপর্যয়কর মহামন্বন্তরের সত্য স্বরূপ—শুধু দেখে যা। তুই কিন্তু থাক—নিরঙ্কুশ। কবি তুই রাজু—তোর গ্রাম্য ভাষায় লিখে রেখে যা এই মহামৃত্যুর ইতিহাস। এ শুধু দেহের মৃত্যু নয়—আত্মার মৃত্যু। জন্মজন্মান্তরের সমাজ-জীবনের মৃত্যু—যুগ যুগান্তরের ঐতিহ্যের মৃত্যু! এমন মৃত্যু রোগে শোকে ভূমিকম্পে বজ্রাঘাতে তো হয় না! এ মৃত্যু মানুষের জগত থেকে মানুষকে পশু-জগতে রূপান্তরিত করবার মৃত্যু। মৃত্যু নয়—এ মহাকালের অভিশাপ। প্রলয় নৃত্য—যে নৃত্যে তাঁর পদতলে অগ্নি জ্বলছে, আবার যে নৃত্য তাঁর জটাজুট থেকে মাতা ভাগীরথীকে মুক্ত করে প্রবাহিত করে দেবে—এই মহাপাপকে, এই মহাধ্বংসকে, এই মহাশ্মশানকে পুনরুজ্জীবিত করে, শ্যামল করে, সুন্দর

করে গড়ে তুলবার জন্য। সেই গল্পে যেমন আছে, মন্ত্র পড়ে ভেড়া-ছাগল বানিয়ে দেবার কথা—এই মৃত্যুও যেন তাই। ভেড়া-ছাগল হয়ে গেল সব। এর ইতিহাস কি লেখা থাকবে না? কে লিখবে—কার সে শক্তি আছে? এই মরণের ইতিহাস কোন্ জীবন-স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে রাখতে পারবে?

ওদিকে কে কাসছে—খক্—খক্—খক্। এই মরণের বীথিকায় জীর্ণ জীবনের শেষ যুদ্ধ—ছটফটানি। মাখন ডোম কাসছে পাশের কুঁড়েতে। কাসির ধমক থামছেই না। দেখে আসবে নাকি রাজু একবার! ওর তো কেউ কোথাও নেই। একটা জোয়ান ছেলে ছিল—বছর চার আগে মরেছে, তার বিধবা বৌটা এই চার পাঁচ মাস আগে পর্য্যন্ত শ্বশুরের সেবা করতো। কিন্তু যোয়ান মেয়ে, বুড়ো শ্বশুরের সেবা করার পুণ্যি সঞ্চয় করে মরে যাওয়ার চাইতে পালিয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টাই সে করেছে। একদিন ভোর বেলা পালিয়ে গেছে ছুঁড়ি। যাবেই না বা কেন! চব্বিশ পঁচিশ বছরের শক্ত-সমর্থ মেয়ে—খেটে খাবে কোথাও—না হয়, আর কিছু করেই খাবে! মরতে কে চায়, বলো! বেশ ছিল কিন্তু সুখী। রাজুর ইচ্ছে ছিল—ওকেই সাঙ্গা করবে। করতো হয়তো এতদিন। ময়না পছন্দ করতো না বলেই হয়নি। সুখীর চরিত্র সম্বন্ধে ময়না বরাবর সন্দেহ করে এসেছে। তাই ভাইয়ের বৌ হতে দেয়নি তাকে। যাক গে। মাখনা বুড়োকে একবার দেখে এলে হয়। রাজু লণ্ঠনটা নিয়ে বেরুলো। পাশেই ছোট্ট কুঁড়ে। আগুড় দেওয়া দরজা—ঠেলা দিতেই খুলে গেল। জীর্ণ তেলচিটে বিছানায় মাখন পড়ে আছে। আরশুলাগুলো উড়ছে ফরফর করে। ইন্দুরগুলো কিচমিচ শব্দ করে পালিয়ে গেল। মাখন কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে চাইল রাজুর দিকে। ত্রাসিত দৃষ্টি। ভীত, সন্ত্রস্ত, মৃত্যু-যন্ত্রণাক্লিষ্ট দৃষ্টি! রাজুকে যেন ও যমদূত ভেবেছে। রাজু

একচোখ দেখেই বুঝলো—দুতিন দিন অনাহারে আছে বুড়ো। একটা মাটির ভাঁড়ে জল ছিল হয়তো—এখন এক ফোঁটাও নাই। মাখনই খেয়েছে, না হয় ইন্দুর-আরশুলাতে খেয়ে গেছে। ঘরটায় দুর্গন্ধ ; রাজুর কষ্ট হচ্ছে দাঁড়াতে, কিন্তু মাখন আত্মীয়—ঘরের কাছে পড়ে মরে থাকবে—এটা রাজুর কাছে অকর্ত্তব্য বলে মনে হয়। ডাক দিল—জ্যেঠা! ও জ্যেঠা!

—উঁ—উঁ—কে?

—আমি রাজু!—বলল রাজু, কিন্তু বুঝতে পারলো—লোক চিনবার ক্ষমতা মাখনের নাই। চট করে গিয়ে এক গেলাস জল আর খানিকটা জমাট দুধ নিয়ে এল। জলে দুধে মিশিয়ে শুকনো তালপাতা জ্বেলে গরম করে ফেলল দুধটা! তারপর মাখনের মুখে ঢেলে দিতে লাগল আস্তে আস্তে! গিলতে পারছে না! দু'কস বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। তার ওপর কাসি! জীর্ণ পাঁজরাগুলো দুলে দুলে উঠছে কাসির ধমকে। হয়তো এখনি মরে যাবে। এই দমটাই হয়তো শেষ দম। কিন্তু না —মাখন আবার নিশ্বাস ফেলল। আশ্চর্য্য! কত যে কচি ছেলে মরে গেল—কত যোয়ান ছেলে দুটো শ্বাসটান দিয়েই অক্কা পেল—আর এই সত্তোর বছরের বুড়ো এখনো বেঁচে আছে! এই জীর্ণ দেহপিঞ্জর ছেড়ে ওর প্রাণপাখী যেন যেতেই চায় না! রাজুর অবাক লাগছে। তিন চারদিন হয়ত খায়নি মাখন। তবু কেমন করে বেঁচে আছে এখনো! এত লোক,—যোয়ান, শক্ত, সক্ষম লোক সব মরে গেল, আর বেঁচে রইলো মাখন! কিন্তু রাজুর মনে পড়ল—মাখন ছিল গাঁয়ের চৌকিদার। মস্ত লম্বা তার দেহখানা যখন রাতের অন্ধকারে বল্লম হাতে রণ দিতে বেরুতো তখন ওর মূর্ত্তি যে দেখেছে সেই ভেবেছে, বাপরে! কি যোয়ান! দৌড়ে চোর ধরতে মাখনের জুড়ি কেউ ছিল না বলে একবার 'ম্যাজিস্টর সায়েব' ওকে পুরস্কার দিয়েছিল। সেই মাখন পাকা হাড়ে আজ শয্যা নিয়েছে। ভীষ্মের শরশয্যা। উত্তরায়ণ না হলে ও দেহত্যাগ

করবে না! রাজু জল দিল আর একঢোক। মহাবীর ভীষ্মকে যেন রাজু ভাগীরথীর অমৃত ধারা পান করাচ্ছে, এমনি একটা আত্মপ্রসাদ জাগছে মনে। মাখন মৃত্যু-উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি দিয়ে চাইল। কি যেন বলতে চেষ্টা করছে, রাজু বুঝলো, মাখন কথা বলতে পারছে না। মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে শুধুলো,—জ্যেঠা? কিছু বলবে? বলো!—রাজু ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল।

অতি কষ্টে মাখন একখানা হাত তার ছেঁড়া বালিশের তলায় এনে দেখালো রাজুকে। কিছু আছে হয়ত ওখানে; রাজু বালিশটা একটু তুলে দেখলো—একটাকার ছ'খানা নোট—মাখনের যথাসর্ব্বস্ব ঐ মাথার বালিশের নীচে গোঁজা। ছ'টা টাকা এখনো ওর সম্বল। রাজু নোট কযখানা বাব করতেই মাখন ইসারা করলো,—তুই নে—তারপর জড়িত কণ্ঠে বলল—মুখে আগুন দিস। রাজু নোটগুলো একদিকে রেখে মাখনকে ভাল করে শোযাতে চেষ্টা করছে, মাখন আবার বলল অস্পষ্ট ভাবে—ধান ক'টা লিস তু, বুঝলি!

হ্যাঁ—বিঘে তিনেক জমি আছে মাখনের। নিজের হাতে পতিত ডাঙা ভেঙে মাখন ঐ জমি তৈবি করেছিল। ভালো জমি—খুব ধান হয়—এ বছরও মাখন ধান গাছ লাগিয়েছে ঐ জমিতে, কিন্তু তারপর আব দেখতে যেতে পারেনি। রাজু কিন্তু দেখেছে, ধানগুলো বেশ বেড়ে মেঘের মত কালো হয়ে উঠেছে।—দেখে এসেছে রাজু। যে ধান গাছ নিজের হাতে অত কষ্ট করে পুঁতেছে মাখন, সে-ধান কাটবার জন্য ও আর থাকবে না—তাই রাজুকে দান করে যেতে চায়। কথাটা বলতে গিয়ে বেদম কাসতে লাগল মাখন। শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কাসির বেগে গলার হাড়গুলি বেরিয়ে ঠিক প্রেতের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটো যেন জ্বলছে ওর। অত বুড়ো বয়সেও অমন জ্বলন্ত চোখ—রাজু আর কখনো দেখেনি।

ইবারে বৃষ্টি নামলো। ময়না হয়তো রাস্তায়, ভিজে যাবে। রাজুর অন্তর চিন্তিত হয়ে উঠেছে ময়নার জন্য। মাখন আর একবার কিছু যেন বলবার চেষ্টা করলো—ধানগুলো—বুঝলি—ঐ হারামজাদী সুখী—যেন—না লিতে পারে—বু-ঝ-লি!—ক্লান্ত, আড়ষ্ট হয়ে গেল মাখন। একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা ঘরের চালটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল—আগুড়টা খুলে গেল। যমদূত প্রবেশ করছে হয়ত! রাজু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মাখনের দিকে। খাবি খাচ্ছে মাখন! "হরিবোল—হরিবোল—গঙ্গা নারায়ণ—ব্রহ্ম"—উচ্চারণ করলো রাজু। অন্তিমক্ষণের শ্রোতব্য এই তারণমন্ত্র। পর-পারে যাত্রার মূল্যবান পাথেয়। মাখনের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। ঐ হাওয়ার দমকাটাই ওকে নিয়ে গেল তাহলে! ঐ হাওয়া-রথেই এসেছিল যমদূত!

ডোমের ছেলে রাজু—ভয়-ডর কোনো কালে নাই ওর। কিন্তু আজ পাড়াটা নিচালি হয়ে গেছে। কোনো কুঁড়েতে কেউ আছে হয়তো কিন্তু সাড়া পাওয়া যায় না। মাখনের চামড়া ঢাকা মড়া হাড়গুলো আর চোখের খোলা তারাদুটো রাজুর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করছে আজ। ময়না যে কেন এখনো আসছে না! কি করবে রাজু এখন মাখনের দেহখানা নিয়ে! লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ও বেরিয়ে এল। আগুড়খানা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে এসে ঢুকলো নিজের ঘরে। ভয়ই পেয়েছে রাজু। ভূতের ভয়। নিজের ঘরে এসে যেন ভয়টা খানিক কাটল ওর। চেয়ে দেখলো জগন্নাথের পটের পানে, কালীঘাটের কালীর পানে। আলোটা নামিয়ে রাজু আবার বসল। বিড়ি ধরালো একটা। ময়না এখনো আসছে না। আজ যেন বেশি রাত হচ্ছে। না—রাত বেশি হয় নি! তা ছাড়া বৃষ্টি পড়ছে। কি করেই বা আসবে ময়না! হয়ত পথের ধারে গাছতলায় দাঁড়িয়েছে—হয়ত, বৃষ্টি দেখে বার হয় নাই—কারখানাতেই আছে। কিম্বা নদীতেই হঠাৎ বান এসে পড়েছে। কিন্তু বান এলে রেলের পুল পেরিয়ে

আস'ত পারবে। ময়না এসে পড়লে রাজু যেন বাঁচে। বড্ড একলা একলা লাগছে ওর।

অলোটা কম করে দিয়ে বিড়ি টানতে লাগল। ওঘরে মাখনের মৃতদেহ। আজ আর কিছু গতি করা সম্ভব নয়। কাল সকালে রাজু লোক ডেকে নদীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে দেবে জ্বালিয়ে। আহা! না খেয়েই মারা গেল মাখন! ছ'টা টাকা বালিশের তলায় ছিল—তবু না খেয়েই মরলো! রাজু যদি তুদিন আগে দেখতে যেত ওকে! তুঃখু হতে লাগল রাজুর। তবু শেষটায় এক ঢোক জল খেতে পেয়েছে, একটা ঢোক তুধও। ময়নার আনা তুধ। ময়নার আনা চাল আজ তারণ ঠাকুরের দিদি-বৌ খেয়েছে। কুন্তিরা ঘরগোষ্টি খেয়েছে। মাখনও তুধ খেল। ময়না যে ভাবেই এসব সংগ্রহ করুক···রাজু তাই দিয়ে কিছুটা পুণ্যি সংগ্রহ করেছে। সেই পুণ্যিটুকু ময়নার পাপকে যেন ধুয়ে দেয়—ময়নাকে যেন নিরাপদ রাখে!

কিন্তু ময়না খারাপ কিছু করেছে—বিশ্বাস করে না রাজু, এখনো বিশ্বাস করে না। ওর স্নেহশীল ভ্রাতৃ-অন্তর ময়নার কোন কাজ অসমর্থন করেনি কোনোদিন। ময়নার সব বায়না রাজু অকুণ্ঠিত চিত্তে মিটিয়ে এসেছে। আজ যদি সত্যিই ময়না পাপের পথে উপার্জ্জন করে, তাও রাজু সমর্থন করবে। সয়ে যাবে। সয়ে গেলই তো! সকালে কতখানা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল রাজু। আর এখন! এখন তো আর রাগ হচ্ছে না ময়নার উপর। তুঃখও হচ্ছে না খুব। খেয়ে যদি বেঁচে থাকতে পারে ময়না তো সেই ঢের। মরেই তো গেল সবাই—গাঁয়ের অর্দ্ধেক মরলো! রাজু তো মরতোই, ময়নাও মরে যেত। না, তার থেকে ময়না বেঁচে থাক। বড় কষ্টে মানুষ করা ওর ময়না। মনে পড়ল, কাজোড়ার সোনাদীঘিতে যখন খাটতে যেত রাজু ময়নাকে কোলে নিয়ে,—তখন ময়না এতোটুকুন,

আড়াই-তিন বছরের। দীঘি খোঁড়া মাটিগুলো যেখানে ফেলে পাহাড়ের মত উঁচু করা হোত—সেইখানে বড় একটা পাকুড় গাছ—তারই ছায়ায় ঐ ভিজে মাটির নরম বিছানায় ময়নাকে শুইয়ে দিত রাজু। ময়না ঘুমুতো, নাহয়, জেগে মাটি নিয়ে খেলা করতো। ওর পাশ দিয়ে কাজোড়া গাঁয়ে যাবার রাস্তা। যে দেখতো—এমন কি, বাবুরাও বলে যেত—আহা! কি সুন্দর মেয়েটা! রাজুর অহঙ্কার হোত কত! তার বোনকে সবাই সুন্দর বলে! কি নাম রাখবে, তখন থেকে ভাবতো রাজু। শেষে ঐ তারণ ঠাকুরই ঠিক করে দিয়েছে ওর নাম—ময়না। ভাল নাম মধুমালতা। তারণের বৌ বলে ময়নামতী। এসব নাম জানে রাজু, আর ঐ তারণ ঠাকুর। আর কেউ জানে না—শুনলে হয়তো ঠাট্টা করবে। রাজু তাই কারুককে বলে না সে নামটা। ময়না কিন্তু জানে। ও মাঝে মাঝে দাদার পেনসিল দিয়ে বড় বড় করে লেখে—মধুমালতী ডোম্, সাকিন্ লাট্‌কোনা—। রাজু দেখে আর হাসে, বলে—'ডোম' কেনে লিখছিস—'দাসী' লিখ! ময়না শুদ্ধ করে লেখে 'দাসী'।

—দাদা!

—আয়—আয় মনি! ভিজে গেলি র‍্যা?—রাজু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে আলো নিয়ে বাইরে এল। ময়নার আপাদমস্তক জলে ভিজে গেছে। শাড়িখানা লেপ্টে গেছে গায়ে—কিন্তু—কিন্তু—ও কি শাড়ি! ও কাপড তো রাজু কোনোদিন দেখে নি ময়নার পরণে। ফিনফিনে পাত্‌লা—যেন মাকড়সার জাল। গায়ের সঙ্গে লেগে কাপড় যে আছে তা বোঝাই যাচ্ছে না। বাবুদের মেয়েরাও পরে না অমন পাতলা কাপড়। রাজু দাঁড়িয়ে গেল আলো নিয়েই।

ময়না অত্যন্ত ক্লান্ত; পা-টি পা-টি করে ঘরে ঢুকে ঝুড়িটা নামালো, —আলনা থেকে একটা ছেঁড়া কানি টেনে নিয়ে গা মুছতে লাগল।

রাজু আলোটা দরজার কাছে নামিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে ওর গা—ভ্রূক্ষেপ নাই! যে কথা ও এই সারাদিন বিশ্বাস করে নাই, এতক্ষণে সেই কথাটা নির্ম্মম সত্য হয়েই দেখা দিয়েছে। শুধু কাপড়খানাতেই নয়—ময়নার দেহে, ময়নার চোখ-মুখে, সর্ব্বত্র! ঐ দেহশ্রী রাজু চেনে। ওর বৌটা বছর দুই আগে একটা মরা ছেলে প্রসব করে মারা যায়, রাজুর আজো মনে পড়ে তার সর্ব্ব অবয়ব। কালো কুচকুচে মেয়ে ছিল সে—কিন্তু সুন্দর হয়ে উঠেছিল শেষের দিকটায়। রাজুর বেশ মনে আছে তার দেহের পরতে পরতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

ময়না কাপড়খানা ছেড়ে একটা ছেঁড়া টেনা পরলো। তারপর রাজুর চ্যাটাইটায় বসে বলল—ভিজছো যে দাদা—ঘরকে এস!

—হুঁ—যাই!—রাজু ঘরেই ঢুকলো এসে। বসল একধারে। কথা যেন কইতে ইচ্ছে করছে না।

—কাপড়টো গিন্নীমা দিলো দাদা—তাই পরে এলুম। আমারটো ছিঁড়ে গেইছিল—ময়না বলল।

—বেশ—রাজু উত্তরটা দিয়ে বাইরে বৃষ্টিধারার দিকে চাইল। ময়না অন্য দিন অনেক কথাই বলে; আজ কিন্তু ভয় ভয় করছে ওর। একটু থেমে, একটু কেসে বলল—কিছু যে রাঁধো নাই দাদা?

—নাঃ, মাখনজ্যেঠা মরে গেল আখুনি! পড়ে আছে ঘরেই। সকালে গতি করতে হবে ওর।

—আহা! কখন ম'ল্ল? চল তো, দেখে আসি!

—থাক-গা! তু খাবি কিছু?—রাজু প্রশ্ন করলো!

—না—আজ আর খাব না কিছু। খেয়েই বেরিয়েছিলোম—

ময়না ঐ চ্যাটাইয়ের এক পাশেই শুয়ে পড়ল! পাতলা কাপড়খানা ছেড়ে ছেঁড়া কানিটা পরে আসবার সুযোগ করতে পারে নি ও

আজ। রাস্তার মাঝে বৃষ্টি এসে সব বিপর্য্যস্ত করে দিয়েছে। ভেবেছিল—দাদা অত লক্ষ্য করবে না। হয়তো লক্ষ্য করে নাই। কাপড়ের সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎও দিয়েছে ময়না। দাদা নিশ্চয় কিছু সন্দেহ করবে না। ময়না নিশ্চিন্তে চোখ বুজে-বুজেই বলল,—আলোটা নিমিয়ে শুয়ো দাদা—রাত হইছে এনেকটো!

রাজু কোনো উত্তর দিলো না—আলোর শীষটা কমিয়ে দিল। দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল ময়না। রাজু বসে আছে তখনো। নির্নিমেষ হয়ে তাকিয়ে আছে ময়নার দিকে। তেলচিটে কালো কাপড়ের টুকরো ময়নার পরণে। অৰ্দ্ধেক অঙ্গও ঢাকা পড়ছে না ওর। দিনের বেলা ময়নাকে কত দিন দেখেনি রাজু, রাত্রেও কোনোদিন এত ভাল করে দেখেনি। দেখবার অবসর হয় না। ময়না এসেই একথা-সেকথা বলতে থাকে। রান্না করে, না হয়, ঘর ঝাড়পুঁছ করে। না হয়, রাজুকে খাওয়াতে লেগে যায় নতুন কোনো আহৃত বস্তু। উৎসাহের অন্ত থাকে না ময়নার। আজই কেমন যেন ব্যত্যয় ঘটেছে। রাজু উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ময়নাকে। কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। একটু ঠেলে দিল রাজু। চিৎ হয়ে গেল ময়না—ঘুমুচ্ছে। নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। আলোর শীষটায় জোর দিয়ে রাজু দেখতে লাগল—হ্যাঁ, ঠিক! পেটটা উঁচু হয়ে উঠেছে—কালো দাগ পড়েছে বুকের পুষ্প-বৃন্তে। সন্দেহ কববার কিছুমাত্র অবকাশ আর নাই। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি—রাজু তারই মধ্যে এসে দাঁড়াল বাইরে। হাতে তখনো বিড়ি দেশলাই। ধরানো হয় নাই। সেই ময়না,—কোলের ভেতর কুঁকড়ে থাকতো রাজুর। খিদে পেলেও কাঁদতো না ময়না। মাইদুধ না থাকায় রাজু গাইদুধে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ওকে চোষাতো। তারপর—বড় হোল ময়না। খেলতে শিখলো, কাজ করতে শিখলো, রান্না করতে শিখলো—আজ রোজগার করতে শিখেছে! হ্যাঁ, রোজগারই করছে তো! আর রাজুকে

সেই রোজগারের চাল ডাল খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখছে। বাপ যেমন ছেলের রোজগারে খায়—ভাই যেমন ছোট ভাইএর রোজগারে খায়। নাঃ, ময়নার রোজগার সে-রকম নয়। ময়নার রোজগার পাপের রোজগার—লজ্জাবজনক নষ্টচরিত্র নারীর রোজগার!—ও', ওঃ!

রাজু মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে বিড়িটা ধরাবার চেষ্টা করলো। ঘরের ছাঁচকোলে দাঁড়িয়ে জ্বাললো দেশলাই। দেবে নাকি জ্বেলে ঘরটাতে আগুন! দেবে জ্বেলে? ঘুমুচ্ছে ময়না—ঘুম পাড়াচ্ছে কোথাকার কার একটা ছেলেকে ময়না গর্ভের কোমল শয়নে। জ্বালিয়ে দেবে নাকি রাজু সেই সুকোমল গর্ভশয্যা! দেবে জ্বালিয়ে? দেবে?—হাতের জ্বলন্ত কাঠিটা রাজু চালের কাছে ধরলো। যাক—জ্বলে পুড়ে যাক ঐ হতভাগ্য ভ্রূণ—তার সঙ্গে ময়নাও। না—না—না—রাজু আঁৎকে উঠে যেন কাঠিটা ফেলে দিল। ভিজে চাল না হলে এতক্ষণ দাউদাউ করে হয়তো জ্বলে উঠতো আগুন। এ কী করতে যাচ্ছিল রাজু? উঃ, ভগবান! ময়নাকে মেরে ফেলতে গিয়েছিল রাজু এখনি! কেন? কি এমন করেছে ময়না! কিসের পাপ? পাপ কিসের? বেঁচে থাকবার জন্য লোকে কত কি করে—চুরি করে, ছেনালি করে—খুন পর্য্যন্ত করে! ময়না এমন আর কি করেছে! ময়না—ওর কচি কাঁচা বোনটি, ওর কত আদরের সোনার বোনটি:

> "ময়না পাখী—ময়না পাখী—গয়না দিব গায়,
> দুফর রাতে বায়না লিলে গয়না কুথায় পাই।
> আজকে রাতে ঘুম যাও রে ময়না—মাণিকধন,
> কাল সুকালে কিনে দিব সোনারো কঙ্কন॥"

মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল কত ফেলে-আশা দিনের শান্ত মূর্চ্ছনা, কত স্মৃতির সৌরভ, কত অবলুপ্ত অশ্রুর কাহিনী, হাসির ঝর্ণা, আনন্দের তুফান! ময়নাকে অবলম্বন করেই তো জীবন ওর। রাজু

বিড়িটায় জোর একটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঘরে ঢুকলো এসে। ময়না ঘুমুচ্ছে—ঘুমুচ্ছে ময়না। ছোট্ট খুকিটির মত ঘুমুচ্ছে। মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে যেন। কিছুই কি খায় নি নাকি? রাজু হেঁট হয়ে ওর কপাল ছুঁলো। চুলগুলো রয়েছে লোটন বাঁধা,—ভিজে। অসুখ করতে পারে। রাজু খুলে এলিয়ে দিল চুলগুলো। কালো কোঁকড়া চুল তালপাতার চ্যাটাইটার উপর মর্ম্মরিয়ে উঠলো। গহন অরণ্যের বিভূতি যেন এই চুলে। আঙুলের ফাঁকে চিরুণীর মত করে রাজু চুলগুলি আঁচড়ে দিচ্ছে। এই সেদিনও রাজু ময়নার মাথা বেঁধে দিয়েছে। চার-গোছা করে বেণী পাকিয়ে দিয়েছে। খোঁপায় ফুল পরিয়ে দিয়ে তৃপ্তি হয়নি—দোলের মেলায় জরির ফিতে কিনে এনে পরিয়েছে।

—ময়না—! মাথাটা একটু টেনে তুললো রাজু, চুলগুলো ভালো করে শুকুতে দেবার জন্যে। ময়নার মা থাকলে ঠিক এমনি করেই ময়নাকে দেখতো আজ। হয়তো আরো বেশি যত্ন করতে পারত এ সময়। রাজু চেয়েই রইল অনেকক্ষণ ময়নার দিকে। ময়নার গর্ভে নবাগত অতিথি—'জীবনের ভবিষ্যৎ জয়গান!' তারণ ঠাকুরের লেখাগুলো মনে পড়ছে রাজুর। অমনি দুঃখের মধ্যে রাস্তার ধারেও শিশুর জন্ম হয়। তারণ ঠাকুর লিখেছে। ময়নার হবে, কিন্তু সেদিন রাজু যেন তাকে এই ঘরের মধ্যেই রাখতে পারে। যেন এক গ্লাস গরম দুধ খাওয়াতে পারে। কিন্তু ময়নার ছেলে হলে, সে ছেলের কোন পরিচয় থাকবে না, কোনো সমাজ থাকবে না। ঘৃণাই করবে সকলে তাকে। তাকে নিয়ে কি করবে রাজু! কোথায় রাখবে? না—না— সে ছেলে হয়ে কাজ নেই। সে ছেলেকে রাজু মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নুন দিয়ে টিপে······ময়না নড়ে উঠলো; পাশ ফিরলো। মুখটা নাড়লে—শুকিয়ে রয়েছে ঠোঁটদুটি! রাজু বুঝতে পারে ময়নার পিপাসা। জল এক ঢোক হয়তো খাবে ময়না। কিন্তু ঠাণ্ডা জল,—অসুখ করতে পারে ময়নার। একেই তো ভিজে চুল—ভিজে

মেঝেতে চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে রয়েছে। যদি অসুখ করে—সামলাবে কি করে রাজু! একটা কাঁথা কেন যে পেতে শুলো না ময়না! বড্ড হয়ত ক্লান্ত হয়ে এসেছে। অতটা রাস্তা—নদী—ঝোপজঙ্গল ভেঙ্গে আসতে হয়। ক্লান্ত তো হবেই। তার উপর পেটে ছেলে—চার-পাঁচ মাস হবে বোধহয় ওর। না, অসুখ হতে দিলে চলবে না। চা করে খাওযাবে নাকি? গরম চা, বেশী একটু দুধ দিয়ে? হ্যাঁ, তাই খাওয়াবে। মাখন-জ্যেঠা মরেছে তো কি আর এমন হয়েছে? কোন পুরুষের জ্ঞাতি ওর? চা খেলে কিছু দোষ হবে না। রাজু উনুন ধরালো। শুকনো তালপাতাব আগুন জ্বলে উঠতেই ময়না চোখ মেলে বলল,—কি দাদা—কি?

—কিছু না রে, চা খাব। ঘুম ভাংলো তুর?

—হুঁ, উঠো—আমি করছি চা।

ময়না উঠে বসল। কাপড় সামলে এগিয়ে এল। রাজু ওকে ঠেলে দিয়ে বলল—না—যা তুই শো! আর না হয়, আগুনের আঁচে শুকো চুলগুলোন। যা একবোঝা চুল!—রাজু সস্নেহে আর একবার নেড়ে দিল চুলগুলো।

* * *

ভিজেছে বারুণীও। জল সট্‌সটে শাড়িখানা সামলে মাথার ঝুড়িটা বাঁ-হাত দিয়ে ধরে সাবধানে ও ঘরের নীচু সদর দরজা পার হ'য়ে ভিতরে ঢুকেই দেখলো—মহামারী কাণ্ড! নাটু মোড়ল বসে আছে ঘরের চালায়, নাটুরই লণ্ঠনটা আলো বিকীর্ণ করছে সতেজে। ওর পায়ের কাছে কিষ্ট। খানিকটা দূরে গাঁয়ের আরো দু'তিনজন মাতব্বর—কুমদীশ, শশাঙ্ক, শম্ভু, হরিচরণ একটা চ্যাটাইয়ে বসে। এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারুণীর মা—ওর কোলের বাচ্চা মেয়েটা ভীষণ চীৎকার করছে। ভয় পেয়েছে হয়ত এতগুলো লোক দেখে। বারুর বাপ—এদিকে নাটু আর ওদিকে মাতব্বরদের

মাঝখানে হাঁটু গেড়ে দণ্ডবৎ করার ভঙ্গীতে বসে বলছে,—আমি ই-সব জানি না হুজুর!

—জানিস না?—হারামজাদা!—নাটু চীৎকার করে উঠলো,—তোর বিটি উথেনে কি কত্তে যায়?—দশখানা গাঁয়ের লোক জানলো, আর তু বিটা জানলি না? চালাকি পেইছিস!

—আজ্ঞে!—আমি কিছু জানিনা মোড়ল! ই কথা শুনিই নাই আমি! খাটতে যায়। চাল ডাল পায়, তাই খাই আমরা, এই জানতোম।

—বেশ, জানিস না—আখুন তো জানলি! চুলের মুঠো ধরে বিটিকে কিষ্টের ঘরে দিয়ে আয়!

বারুণী উঠোনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেছে। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি, এদিকে থমথম করতে লাগল ভিতরে ঘরখানা!

—তা বই খাব কি আমরা! না খেয়ে মরবো নাকি আমরা? বারুণীর মা প্রতিবাদ করল।

—মানে! তু কি খাবি তার দায়ীক আমরা নাকি? কিষ্টে যদি তার বিয়েলি বৌকে না ছাড়ে?

—কিষ্টের লিজেরই একবিলা খাতি জুটে না, খইবে কি যে বিয়েলি বৌ নিয়ে ঘর করবে?

—সি ভার তুগে লিতে হবে না—তুই চুপ করে থাক আপনার। বলল শম্ভূ ঘোষ।

—স্থমত্ত মেয়েকে বেউশ্যে-গিরি করাবি নাকি তুই গাঁয়ে বসে?—বলল কুমদীশ।

—ই সব অনাচার হতে দিব না আমরা। ই কি মগের মুলুক যে, যা-তা করবি!—বলল হরিচরণ।

কিষ্ট করযোড়ে বসে। এই পঞ্চায়েতের মজলিসে ওর ভাগ্য নির্ণয় হচ্ছে; কাজেই ও পরম ভক্তিতে আসীন। বারুণীকে ও চার পাঁচ

বছর আগে বিয়ে করেছিল দু কুড়ি পাঁচ টাকা পণ দিয়ে। তা'ছাড়া গয়না,—পায়ে তোড়া, কোমরে গোট, কানে ফুল। রূপার গয়না ছাড়াও কিষ্ট একটি সোনার নথ দিয়েছিল বারুণীকে, নগদ ন' টাকা তার দাম। কিষ্ট তখন লোকের ঘর ছাদন করে ভালই রোজগার করতো। কাজেই বৌকে সাজাতে তার কার্পণ্য ছিল না। তা' ছাড়া বৌ তো যেমন তেমন বৌ নয়—সুন্দরী বৌ। যে দেখে, সেই বলে—"বাহা রে মেয়েটি। কাদের বৌ লো!'

সেই সব গয়না-পত্তর নিয়েই বারুণী আজ মাস চার পাঁচ বাপের বাড়ী এসে উঠেছে, ফিরে যাবার আর নামটি করছে না। আবার নদী পেরিয়ে খাটতে যাচ্ছে উদিকের কারখানায়। খাটতে যে কেমন যায়—তা কিষ্ট ভালই জানে। ওর সোমত্ত সুন্দরী বৌ এমন করে শয়তানি করে বেড়াবে—এটা কিছুতেই সে সইতে পারছে না। ওর মাথায় আগুন জ্বলছিল ক'দিন থেকে। আজ নাটু মোড়লের আশ্বাস আর সহায়তা পেয়ে বারুণীকে ও ঘরে নিয়ে যেতে এসেছে, নিয়ে যাবেই। বারুণী উঠানে দাঁড়িয়ে এক মিনিটেই ব্যাপারটা বুঝে নিল, তারপর ভিজে কাপড়েই চালের ঝুড়িটা মাথায় ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে নামাল ঝুড়িটা।

—কুথা থেকে আনলি ইসব! তুর কুন্ বাবা দিল হারামজাদি? বলল ওর বাপ চেঁচিয়ে।

—তুমি থামো দেখি!—বলে বারুণী উদ্ধত ভঙ্গীমায় এসে দাঁড়ালো সবার মাঝখানে, বলল—কিসের লেগে এত ঝামেলা—শুনি। কার বুকে ধান ভেনেছি আমি যে এত কলংখ দিছ সব?

—থাম্ বারুণী, থাম্—নাটুই বলল—ই সব ভাল কাজ লয়, বুঝলি! তুই কিষ্টের বিয়ে করা বৌ! উ তুখে দিবে কেনে ইসব করতে? আমাদের কাছে নালিশ করেছে। চল, তুখে নিয়ে যাব ওর ঘরকে।

—ও-মা! নালিশ করেছে? তাই জজ-ম্যাজিষ্টর এসেছেন উনারা বিচের করবেন! আমি যাব না—বিয়ে করেছিল কেনে? দুবেলা পেটের ভাত জুটাতে লাবে—পরতে লুগা দিতে লারে—বলে সেই, 'তিনকড়া নাই ঝুলিতে লাফ মারছে কুলিতে'—হুঁ! যাও সব ঘব যাও। ভাল হবে না বলছি! দুফর রাতে কেলেঙ্কারী কবো না। তু ঢুকতে দিলি কেনে গো মা?

—আমি কি করবো—তুর বাবাকে বল!—ওর মা জবাব দিল।

নাটু সুদক্ষ মাতব্বর। বেশ ঠাণ্ডা মেজাজেই বলল—না গেলে চলবে না—আইন আছে—বুঝলি। কাল ধরে জেহেলে ভরবো, তার চেয়ে ভালয় ভালয় চল বলছি।

—ইস! জেহেল! তুমাদের লেগে জেহেল নাই? তুমি যে সেদিন গোলাপীব ঘরে ··

—চুপ কর হারামজাদা—নাটু অকস্মাৎ উঠে বারুণীর চুলের মুঠো ধরলো। রাগে নাটুর গোল চোখ দু'টো ঘুরছে—বললো—চল্ তুর কোনো বাবা রুখতে পারবে না আজ!—জলে ভেজা উঠোনে নাটু হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো বারুণীকে। মাতব্বরদের সবাই বলল—চল—চল··· !

—যাও, লিয়ে যাও—আমাব কিচ্ছু বলবার নাই—লিযে যাও বাবা কিষ্ট।—বলল ওব বাবা।

ওর মা কেঁদে উঠলো। ওগো আমার বারুকে মেরে ফিলাইছে গো—ওগো তুমরা এসো গো· ওগো আমার বারুকে কড়কড় করে বজ্রেব গর্জ্জন ওর কান্নাকে ডুবিয়ে দিল একেবাবে—আলো হাতে মাতব্বররা সব নাটুকে মাঝখানে নিয়ে বিজয় গর্ব্বে বারুণী সমেত এসে ঢুকলো নাটুরই গোয়াল ঘরের পিছনের ছোট ঘরটায়। তখনো বারুণীর মা গাল দিচ্ছে—লিব্বংশ যাবি—আঁটকুড়ো হবি—মুয়ে পোকা পড়বে—কুঁঠে হবি·· !

বারুণীকে চ্যাংদোল্লা করে বয়ে আনা হয়েছে। একটা হাত, শম্ভু ঘোষ,

অন্য হাতটা হরি—পা'দুটো কিষ্ট ধরেছিল। মাথার চুলের গোছাটা এখনো নাটুর হাতে। বারুণী বেশ বুঝতে পারলে, ওকে এখন রক্ষা করবার কেউ নাই। গাঁয়ের সব মরেছে না-হয় পালিয়েছে। যাঁরা আছে তারা নিজেদের দুঃখেই সারা হচ্ছে। নাটুর মত প্রতাপশালী, চালের মহাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না তারা। অতএব চেঁচিয়ে বা কেঁদে কেটে কিছু ফল হবে না—ভেবে বারুণী চুপ করেই ছিল সারা রাস্তাটা।

যে ঘরটায় ওকে আনা হোল, সেটা গোয়াল ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট একখানা কুঠ্‌রী। উপরে খড়ের চাল। লাঙ্গল, ফাল, গাড়ীর চাকা, জোয়াল ইত্যাদি চাষের সব যন্ত্রপাতি ঐ ঘরে রেখে দেওয়া হয—দরকার মত বার করা হয়। তাছাড়া একটা বুড়ো ছাগল—মস্ত সিংওয়ালা খাসী থাকে—ঐ ঘরটায়। নাটুর আদরের খাসী। বুড়িয়ে গেছে। চলবার সময় মচ মচ আওয়াজ হয় তার পায়ের। নাটু কিন্তু ওকে বেচে নি, বা কেটে খায় নি। ইচ্ছে আছে, ঐ খাসীটা নাটুর ব্যাটার বিয়ের সময় কাটবে। কিন্তু ছেলেটা এখনো বড্ড ছোট। খাসী ততদিন বাঁচবে কিনা কে জানে! ছাগলটার মলমূত্রে ঘরটুকু মানুষ বাসের একেবারে অযোগ্য। কিন্তু নাটুদের দল বারুণীদের মত হরিজনদের মানুষ মনে করে না। ঐ ঘরেই বারুণীকে ফেলে দিল ওরা। একটা চটও ছিল ওখানে—ধানের বীজ রাখা বস্তা—পেতে দিল কিষ্ট। বারুণীকে সেইটায় ফেলে দিয়ে নাটু সগর্বে বলল,—হারামজাদী লচ্ছারী—আমার সঙ্গে চালাকী পেয়েছ? দেখি তুর কোন গোরা-চৌদ্দ পুরুষ রক্ষে করে।

—এই কিষ্টে, তামাক সাজ একছিলিম · কুমদীশ হুকুম করলো। হুঁকো-কলকে নাটুর সঙ্গেই ঘোরে, কিন্তু কাছে তামাক ছিল না। কিষ্ট কি করবে ভাবছে—নাটু বলল—চলো সব, বৈঠকখানায় যেয়ে তামাক খ' যাবে।

—হুঁ—হুঁ! কাপড়-চুপড়ও ভিজে গেইছে—বলতে বলতে সব বাইরে এল। বৃষ্টিটা এখন ধরেছে একটু। ওরা আর দেরী না করে এপাশে নাটুর বৈঠকখানায় এলো। কিষ্ট আর নাটু কিন্তু এখনো দাঁড়িয়ে; লণ্ঠনটা জ্বলছে। বারুণী তার ভিজে কাপড়খানা টেনে গা-হাত ঢাকবার চেষ্টা করছে।—সর্দিতে মরবি যে! ছাড় কাপড়টো—বলল নাটু —যা তো কিষ্টে—হরুকে বল একটা কাপড় দিতে—যা, লিয়ে আয় চট্ করে।

কিষ্ট চলে গেল। নাটু দেখছে বারুণীর যৌবনোদ্বেলিত দেহখানা। শ্যামলাঙ্গী তরুণী। বাইশ তেইশ বছরের কঠিন মাংসল দেহ—খাসিটার চেয়েও মাংসল। ওর মাংস আরো নরম—আরো সুস্বাদু! নাটুর চোখদু'টো জ্বলতে লাগল যেন! ভিজে কাপড়ের আঁচলটায় টান দিয়ে দিয়ে আধ খোলা ক'রে বলল—

—আমার কাছে থাকবি? আমি দিব ভাত কাপড়। কিসের লেগে যাবি অত ধূরকে নদী পার হয়ে—থাক এই খেনে।

—হু—বেশ!—বারুণীর ঠোঁটের কোণায় ব্যঙ্গের হাসি ফুটল। নাটু লক্ষ্য করল না—বলল—কিষ্টকে ভাগাইয়ে দিব আমি। তু' ভাবনা করিস না কিছু; থাক এইখেনে। তুর মা'কে সের দশ চালও কাল সকালেই দিব পাঠাইয়ে। বুঝলি?

বারুণী ঘাড় নাড়ল—বুঝেছে। নাটু হেসে বলল—ময়না ছুঁড়ির ক'মাস হোল র‍্যা!

—আমি কি জানি!—বলে বারুণী উঠে দাঁড়োলো। নাটু ভাব করতে চাইছিল বারুর সঙ্গে কিন্তু ওকে দাঁড়াতে দেখে বলল—উঠলি কেনে? যাবি কুথা?

—যাব না তো তুমার ইখেনে···পথ ছাড়ো মোড়ল। ভাল হবে না বলছি! আখুনি আমি ঐ কারখানায় জমাদারকে বলে তুমার দাড়ী ছিঁড়ে ফেলা করাবো—ছাড়ো – ছাড়ো···!

নাটু প্রাণপণ বলে ওর কাপড়খানা পাক দিয়ে ধরেছে। বারুণী কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না—নিরুপায় হয়ে ও কাপড়খানা ছেড়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়ল ছুটে। নাটু চীৎকার করে উঠল—ধর—ধর শালীকে—ওরে ও কিষ্ট!

কিষ্ট আসছিল কাপড় নিয়ে। বারুণী সুমুখেই পড়ে গেল তার। অন্ধকার হলেও ঘরের লণ্ঠনটার আলোর ছটায় বারুণী লুকোতে পারল না কোনকিছুর আড়ালে। কিষ্ট ওর চুলের গোছাটা ধরে গলায় শাড়ীর পাঁচ জড়িয়ে বলল—হারামজাদী লচ্ছারী! যা কি করে যাবি—যা ইবারে! একটা লাথি মারল কিষ্ট বারুণীর পিঠে। নাটুও ইতিমধ্যে আলো নিয়ে এসে পড়েছে। আবার বারুণীকে ঠেলে ঐ ঘরেই ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। আলোটাও নিয়ে চলে গেল ওরা। অন্ধকার! নিরুপায় বারুণী নিয়তির করাল কোপে পড়েছে আজ।

চ্যাঁচালে কিছু হবে না। ভগবানকে ডেকে লাভ নাই। নিজের উপায় নিজেই করতে হবে। বারুণী রোষে-ক্ষোভে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো—আচ্ছা! দেখে লিব!

—দেখছিস কিষ্টে, দেখছিস? ছুঁড়ি কী রকম বজ্জাৎ। ন্যাংটো ছুটে পালাইছিল র‍্যা!—নাটু যেতে যেতে বলল।

—হুঁ! দেখছি না আবার গুলা! উ কি আর বশ মানবে গুলা! আবার পালাইবে! নাঃ, উকে রেখে কুনো লাভ নাই!

—সি কি কথা র‍্যা—অ্যাঁ! তুর বিয়েলি বৌ! ছাড়বি কেনে তুই?

—ছাড়তে কি চাইছি গুলা! উ যে থাকবে না। গরু বেটে কি, যে বেঁধে রাখবো!

—হুঁ—বেঁধেই রাখবো। যাক দেখি কেমন মেয়ে, দেখি আমি!

কিষ্ট চুপ করে রইল। নাটুই বলল—উপোস দিয়ে রাখবো ছুঁড়িকে।

দেখি ক'দিন থাকে ত্যাজ! হুঁ—হুঁ—বাবা, ই নাটু মোড়লের পাল্লা—জানে না তো! কত হারামজাদীকে দিলুম টিট করে! ই তো কুন ছার!—নাটু অহঙ্কারে দাড়ীটা চুমরে নিল একদফা।

বৈঠকখানায় ওরা সব নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানছে। নাটু ঢুকেই বলল, —চাবিতালা দিয়ে এলুম। থাকুক আখুন দু'চারদিন অমনি। কি বল সব?

—হুঁ—হুঁ! তুমি যা করবে মোড়ল তার উপর আবার কথা কি!—ওরা বলল সমস্বরে।

কিষ্ট বসল মাটিতে আর ওরা সব কাঠের তক্তাপোষখানায়। ওরা সবাই নাটুর অনুগ্রহপ্রার্থী। কতকগুলো কাপড় এসেছে সদর থেকে—আগামী কাল দুঃস্থ-নিরন্ন বস্ত্রহীনদের তাই বিলি করা হবে। বিলির ভার নাটুর উপর। তাই ওরা নাটুর খোসামোদী করে কাপড় পাবার ব্যবস্থাটা আজই পাকা করে রাখতে চায়। নাটু বলল—হুঁ, কত যে কাজ আমার—দাও ছিলিমটো—কাল আবার শালার কাপড় বিলি কত্তে হবে। কাকে কাকে যে দিব—লিষ্টি কর দেখিনি।

কুমদীশ তৈরীই ছিল—পেনসিলটা নিয়ে বলল—হুঁ, এই ধর ভদ্দর লোকদের মধ্যে নকু চক্কোত্তির বুন আর মেয়েটো, আর রাখাল অধিকারীর ছেলের বৌ আর আমাদের পাড়ার আদুরের মা, ক্ষেন্তী আর তার পিসি আর মা, আর আমাদের শান্ত দাদার বৌ, আর·

—থাম্, থাম। ই রকম কল্লে কি আর হিসেব হয়! উসব আমিই ঠিক করছি। আর পাঁচ জনা তো আছে। যাতে কেউ কিছু মনে না করে, তাই কত্তে হবে। তুমাদের ক'জনা আজই লিয়ে লাও ভাই। থান.পঞ্চাশেক আছে কাপড় সবশুদ্ধু। তা' তুমরা পাঁচজনা লাও পাঁচ জুড়া—তা বই যার যা থাকে—হুঁ—বামুন পাড়ায় নকুর ঘর—রাখাল ঠাকুরের ঘর—গিরীশ জ্যেঠার ঘর আর তারণ ঠাকুরের ঘরে দিতেই হবে।

—তারণ ঠাকুর ! উ তো চাকরী কচ্ছে। উখেনে কেনে আবার ?

—চাকরী না ছাই কচ্ছে। বৌটোর যা ছিঁড়া কাপড় দেখলুম সিদিন ! মাথায় দু'মাস হয়তো ত্যাল পড়ে নাই। মাটির কলসী নিয়ে জল আনতে যায়। পিতলেরটো হয়ত বন্ধক দিয়েছে—না হয় বিচেছে—ওদেরও কষ্ট খুব। কত দিন নাকি উনুনই জ্বলে না। কিছু বলতে পারে না কাউকে। ভদ্দর লুকের যে অনেক জ্বালা !

—না হে, তারণ সিদিন পাঁচ টাকা পাঠাইছে ডাকে।

—পাঁচ টাকা ! পাঁচটা টাকায় ক'দিন চলে হ্যা ? টাকায় দেড়পো চাল—খেতে দুটো লুক—বোন আর বৌ। পাঁচ টাকায় ক'দিন চলে ?

—কালই রান্না হয় নাই শুনলুম !—নাটু বলল—তারণ ঠাকুরকে হাতে রাখা চাই—বুঝলে ! উ যদি একটো বক্তিতে করে, তা'হলে জজ-ম্যাজিষ্টরের মাথা ঘুরে যায় !

—হুঁ ! সি কথা খাঁটি সত্যি। কী সুন্দর পদ্য যে লিখে ! সিবার উই তো গাজনের সুময় লিখে দিয়েছিল গায়েনের পালাটি। সেই যে রে—রাজু গাইল জহ্নু মুনির গঙ্গাপান।—

—সি আবার কি র‍্যা ?—শুধুলো হরি।

—জানিস না ? সিবার উপাড়ার লুক সঙ দিল যে মা গঙ্গা সগ গ থেকে নেমে ঐরাবৎকে নাকানি চুবানি খইছে—ঐরাবৎ আমরা। তারণ ঠাকুরকে রাজু ধরলো—জবাব লিখে দিতে হবে—তারণ লিখে দিল—মা গঙ্গাকে জহ্নু মুনি গণ্ডুষে গিলে ফেলাইছে ! রাজু সেজেছিল জহ্নু মুনি ! তার জুবাব উপাড়ার লুক আখুনো দিতে পারে নাই।

—হঁ—হঁ ! বেটে ; নিখেছিল—আজকাল নাকি খবরের কাগজে নিখছে ! সিদিন শুনলোম, নিখে নাকি টাকা পায়।

—যা—মিথ্যুক ! নিখে টাকা পায়—হুঁ ! তা'হলে আর ভাবনা ছিল না কিছু !

—হুঁ য়্যা—পায়। না হলে চলছে কি করে?

—চলছে কুথা আবার! দিদিটো কেঁদে কেঁদে বেড়াইছে। আজই দেখলাম, চাল কিনতে বেরিইছিল, পেল না কুথাও! এতটুকু একটো ছিঁড়া কাপড়। বৌটো বারই হয় না ঘর থেকে। একটো মোটে শাড়ী, তাও বিশ জাবগায় সেলাই। চলছে, না কচু!

—আচ্ছা, নিখ—নিখ—তারণ ঠাকুরের বৌ আর দিদি—একজুড়া করে।—নাটু বলল।

—লিবে নাই ওরা—বলল কিষ্ট—না খেয়ে মরে গেলেও লিবে নাই। আমি জানি দিদি ঠাকরোণকে। অভাব খুব আছে, ঠাকুর টাকা পাঠাইতে লারে ঠিক মতন—কিন্তুক রিলিফের কাপড দিদিঠাকরোণ লিবে নাই কিছুতেই!

—না লেয় তো না লিলো। তার কি করা যাবে হে? লিখ তো আখুন!

অতঃপর গাঁয়েব আরো কয়েকজন লোকের নাম—যাদের অনুগৃহীত রাখলে নাটু এবং মাতব্বর ক'জনের সুবিধা হতে পারবে, তাদেরই নাম লেখা হোল লিষ্টে। নাটু শেষে বলল—তুমাদের চাল কারু চাই নাকি হে আজ?

—হঁ্যা—আমাকে সের দশ দিতেই হবে।

—আমাকেও সের দশ।

—আমার আবার জামাইটো এসেছে আজ! হারামজাদা আসবার যেন সুসময় পেল না! দশ সেরে হবে নাই মোড়ল—সের পনর দাও!

সবাই চালের কাঙাল। নাটু খাতা বার করলো। তিন গুণ চাল আগামী সালের চালের থেকে দিতে হবে, লিখিয়ে নিয়ে হেসে বলল, —নিখাই রইল ভাই! তুমাদের কাছে কি আর লিতে পারব অত! আসলটাই দিও। তবে আর বেশি আমারও নাই চাল। ইবার সব সামলাও।

—তুমার নাই ? বল কি মোড়ল ! চৌদ্দখানা হালের ধান !

—আঃ, বিচলোম যে হে ! তা বই তোমাদিগে দিচ্ছি। আর কত চাল হবে ! যা কিষ্ট, তু খেয়ে লিগা—হরুর সঙ্গেই খা , আমার একটুস দেরী হবে।

নাটু চাল মেপে দিতে লাগল প্রত্যেককে। নিজের হাতে মেপে দেয়। সেরে অন্ততঃ আধ ছটাক কম দেয়—জানে সবাই, কিন্তু কিছু বললে যদি মোটে না দেয়, তারই ভয়ে কেউ কিছুই বলে না। যা দেয় দিক—দিলে হয় ! কারণ চাল আর গাঁয়ে কারো বাড়ীতে নাই। যদি কারো কিছু আছে তো সেটা নিজের খাবার জন্যে। এই নাটুই যা চাট্টি বেচতে পারে বা দান করতে পারে এখন।

সবাই চলে যাওয়ার পর নাটু একছিলিম গাঁজা তৈরী করলো নিজেই। কিষ্ট হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। গাঁজার দমটি দিয়ে আলো নিয়ে বেরুলো বারুণী যে ঘরে আছে সেই দিকে। ঘরটা না খুলে ভাঙা দরজার ফুটো দিয়ে দেখতে লাগল বারুণীকে। বারুণী ঘুমুচ্ছে। দরজাটা খুলে নাটু ঘরে ঢুকলো—ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলো—ক্লান্ত বারুণী ঘুমুচ্ছে। খাসিটা বাদলার দিনে এক কোণে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। নাটু আলোটা টাঙ্গিয়ে রেখে বারুণীর পাশে এল—বারুণী ঘুমুচ্ছে তখনো—ঘুমুচ্ছে নিঃসাড়ে। খাসীরা ঘুমায়—কিন্তু নাটুরা ঘুমায় না !

*   *   *

ওকে চা খাইয়ে আবার শুইয়ে দিল রাজু—ঘুমো, ঘুমো তুই বোনটি, মুখটো শুকুইয়ে গেইছে ! আহা !—রাজুর স্নেহশীল অন্তর ময়নার পরিপূর্ণ মুখখানা, ময়নার জননীত্বের তরল লাবণ্য, ময়নার নিদ্রালস চক্ষুদুটির পানে চেয়ে চেয়ে মমতায় মোহময় হ'য়ে উঠছে। ময়না যে একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে—সে কথা এখন যেন ওর মনেই পড়ছে না। বৃষ্টিটা থেমে গেছে—বাইরে মেঘমুক্ত চন্দ্রালোক। কালো আকাশ এখন

নীলাভ তুষার-সমুদ্রের মত মনে হচ্ছে—কোথাও যেন কোনো দুর্যোগ নাই—কোনো দুর্ব্বলতা নাই—কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নাই। সব সুন্দর—সুষমাময়।

রাজু আর একবার ময়নার ঘুমন্ত মুখখানা ভালো করে দেখে নিল—মা যেমন করে নিদ্রিত শিশুর মুখখানি দেখে। একখানা ছেঁড়া কাঁথা এনে ঢেকে দিল ময়নার গা'—ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে ময়নার। আলোর শিখাটা খুব কম করে কমিয়ে দিল—ময়নার ঘুমন্ত চোখে যেন অস্বস্তি না লাগে। আহা, ঘুমাক!

বাইরে বেরিয়ে এল রাজু। ওঘরে মাখনের মৃতদেহ পড়ে আছে; সকালে রাজু তাকে নদীর শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে। মাখনের আত্মীয় বলতে আর কেউ নেই এখানে—রাজুই করবে মুখাগ্নি। ছ'টা টাকাও রেখে গেছে মাখন। রাজুকে কিছু খরচ করতে হবে না গাঁঠ থেকে। মাখনের সৎকার করা একটা সৎকাজ। এমনি আরো কিছু সৎকাজ করবে রাজু। ভালো কাজ, পুণ্যের কাজ, যে কাজ করলে ময়নার গায়ে কোনো পাপ লাগবে না। ভগবান ময়নাকে যেন কৃপা করেন! ময়নার যেন কোন পাপ না হয়। ময়নার অর্জিত চাল-ডাল আজ কয়েকজনকে দিয়েছে রাজু—ওতে নিশ্চয় কিছু পুণ্য হয়েছে ময়নার। ঐ রকম আরো দেবে—দেবে আরো অনেককে।

কী সুন্দর জ্যোৎস্না যে উঠেছে! আহা! গভীর রাত্রির চন্দ্রালোক! এ যেন স্বর্গপুরীর চন্দ্রালোক! মাতা ধরিত্রী কোলের সব দুরন্ত ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে চাঁদের সঙ্গে যেন ভালোবাসা-বাসির কথা বলছেন। যেন সহবাস চলছে রাত্রির সঙ্গে ঐ চাঁদের। ছেলেমেয়েরা জেগে থাকলে চাঁদ এত সুন্দর হয়ে ফোটে না—রাত্রিও এত চমৎকার সাজ পরে না। রাজু একটা দস্যি ছেলে—লুকিয়ে জেগে রাজু রাত্রির

এই ফুলশয্যা দেখে নিচ্ছে—আড়ি পেতেছে যেন রাজু রাত্রি-রূপা কনে-বো-এর বাসরঘরে।

পা কয়েক এগিয়ে এল রাজু। একটা ছোট ডোবার উঁচু পাড়, সেখান থেকে ধান আর আখের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে নদীতে যাবার রাস্তাটা দেখা যায়। নদীর মানায় কাশফুল আর শরঝোপ-গুলো দুলছে—এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে রাজু। শরফুল এখনো ফোটে নি। ফুটলে কিন্তু চমৎকার দেখায়—ঠিক সাদা সাদা বকের মত—অসংখ্য, অগুন্তি! লতা-বিছুটির গাছগুলো ওদের জড়িয়ে কেমন আদর করে! বিছুটি লতাও দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর; সুন্দর আরো কত জিনিষ! বিষ-লাঙ্গলে ফুল—আহা! কিবা সুন্দর দেখতে! অথচ এমন সাংঘাতিক বিষ যে খেলে আর রক্ষে নাই। ওখানে বিস্তর বিষ-লাঙ্গলে ফুল ফোটে ঐ শরঝোপে। ময়না সেদিন একটা মাথার চুলে গুঁজে এনেছিল। বিষ—তাও কতো সুন্দর! বিষ হলেই যে সুন্দর হবে না—তার তো কোনো মানে নাই। গোখ্‌রো সাপ্‌—সেও দেখতে কত সুন্দর! সুন্দর হলেও বিষাক্ত হতে পারে। বিষও তো সুন্দর হয়! ময়না কত সুন্দর! ময়নার মত সুন্দর ক'টা মেয়ে আছে গাঁয়ে! কিন্তু ময়না আজ বিষ!···রাজু চম্‌কে উঠলো। চিন্তাটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে! আশ্চর্য্য তো! ময়না বিষ? ময়না রাজুর জীবনটাকে বিষাক্ত করে দিল—ব্যাধিগ্রস্ত করে দিল! ওঃ—রাজু কাল সকালে আর বেরুতে পারবে না গাঁয়ে; মুখ দেখাতে পারবে না লোকের কাছে। মকর ডোম জেল থেকে ফিরে তার বাড়ী এসে আর তাড়ি খেতে চাইবে না—মকরের বাবা আর রাজুকে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে বলবে না—'ময়নাকে আমার ঘরেই দিস বাবা।' কারণ—ময়না বিষ—হলাহল! না, না, না,—ময়না কিসের জন্য বিষ হতে যাবে! ময়নাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে; খাইয়ে দিয়েছে ঐ নদীর ওপারের কোন এক

শয়তান, যাকে রাজু চেনে না, দেখেনি। দেখতেও চায় না। ময়না সেই গরল পান করে মুহ্যমান হয়ে গেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে। বিবর্ণ, পাণ্ডুর হয়ে গেছে তার কচি-পাতার মত গায়ের রং। কে সেই শয়তান, রাজুর জেনে কোন লাভ নাই। জানলে কোন লাভ হবে না। ময়নার শরীর থেকে ঐ গরল রাজু বার করে ফেলবে। ময়নাকে আবার নিরাময় করে তুলবে, নিষ্কলঙ্ক করে তুলবে। সে কাজটা এমন কিছুই কঠিন নয়। অতি সহজে ঐ ঈশানের মা—গোলাপীর শাশুড়ীই সেটা করে দিতে পারে। সের দুই কি সের চারেক চাল—ব্যাস! রাজু তাই করবে। হ্যাঁ, করতে হবে তাই!

জ্যোৎস্নাকে দিনের প্রকাশ-সম্ভাবনা ভেবে কয়েকটা কাক ডেকে উঠলো কাছের বড় শিরীষ গাছটায়। কাকগুলো জ্যোৎস্না দেখে প্রতারিত হচ্ছে—নির্বোধ জানোয়ার! রাজুও বেশ প্রতারিত হয়েছে। ময়নাকে কেন সে যেতে দিল ওখানে—কেন? না খেয়ে না-হয় মরেই যেত ভাই-বোনে। একটি বিছানায় ময়নার মাথাটা কোলে নিয়ে মরেই না-হয় পড়ে থাকতো রাজু এই মাটি-মায়ের বুকে, যেমন করে একদিন ওদের মা'র গর্ভে ছিল ওরা! কিন্তু না—মরে যাবার জন্য অত দুঃখে ময়নাকে মানুষ করেনি রাজু। নিজের খাবার ময়নার মুখে তুলে দিয়ে রাজু উপোস থেকেছে কতদিন—আবার বড় হয়ে ঐ ময়নাই কতদিন নিজে না খেয়ে দাদাকে খাইয়েছে আর মিছে করে বলেছে—'খেইছি দাদা!' সে কি মরে যাবার জন্যে? বিন্দু বিন্দু করে ময়নার দেহ-সৌষ্ঠবকে বড় হতে দেখলো রাজু—ময়নার বুদ্ধিকে জোরালো হতে দেখলো রাজু, ময়নার মনকে মেয়েলি হতে দেখলো রাজু—রাজুই লালন ক'রে ওকে মেয়েলি করেছে—আপনার অন্তরের তিল-তিল স্নেহ-সুষমা দিয়ে ওকে তিলোত্তমা সৃষ্টি করেছে—সে কি মেরে ফেলবার জন্যে? —না—না, রাজু ওকে বাঁচাবে! যত পাপ হয় হোক, রাজু ময়নার দেহ থেকে ঐ তীব্র বিষ বার করে দেবে, মুক্ত করে দেবে ময়নাকে—কলঙ্কমুক্ত করে দেবে।

মাথাটা কেমন টিপ্‌টিপ্‌ করছে—ধরেছে নাকি? লম্বা চুলগুলোয় হাত দিয়ে কয়েকটা খাম্‌চি কাটলো রাজু। দু'চার গাছা চুল ছিঁড়ে এল হাতে! আজ সারাদিন রাত মাথায় চিরুণী দেয়নি। জটা বেঁধে গেছে চুল গুলোতে! যাক্‌ গে! রাজুর এখন ওসব ভাববার সময় নাই। রাজু এগুলো আরো।

ডোবার এদিকে পথ, যে-পথ ইষ্টিশনে গেছে—আর যে পথ শাখা মেলে গেছে ঐ নদীর দিকে। এইখানেই সেই পথের তেমাথা। কত লোক ভূত ছাড়ায়—পেঁচো পাওয়া মেয়েদের স্নান করিয়ে নিয়ে যায় গভীর রাত্রে—কত লোক শনির পূজো করে এইখানটায়। তেমাথা পথেই নাকি এই সব করতে হয়। ঠিক ঐখানেই বড় শিরীষ গাছটা কালো ছায়া মেলে রয়েছে। এটা গ্রামের প্রায় প্রান্তদেশ—খানিকটা দূরে গাঁয়ের বালিকা-বিদ্যালয়ের সাদা বাড়ীটার দেওয়াল জ্যোৎস্না মেখে হাসছে যেন—ছোট্ট মেয়েদের যূঁইফুলের মত হাসি যেন ওর গায়ে ছড়ানো। মড়ক পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্কুলটা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু। বেঞ্চি, টেবিল, চেয়ার খালি পড়ে থাকে আজকাল। রাজু এপাশ থেকে দেখতে পেল, যেন কে কাৎরাচ্ছে ঐ স্কুলবাড়ীর বারান্দায়। কে? দেখতে হোল! রাজু এগিয়ে এল ঐদিকে। হ্যাঁ—কাতরাচ্ছে জন দুই লোক—শীর্ণ কঙ্কাল—কিন্তু জীবন্ত! জীবন যেন ওদের বন্দী করে রেখেছে এই ধরার কারাগারে—কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। ওরা অপরাধী, তাই জীবন-দেবতা ওদের ধরে শাস্তি দিচ্ছেন। ওরা ভয়ানক ভয়ানক অপরাধ করেছে! কী সে অপরাধ?—তারণ ঠাকুর লিখেছে তার বইটায়—ঐ "কদম ফুল" বইটায়।—"এই মানুষগুলো অপরাধী—অপরাধী জীবন-দেবতার কাছে! কত শতাব্দি ধরে ওরা সোনার পিঞ্জরে হীরের দাঁড়ে বসে চাল, ছোলা ছাতু খেয়ে জীবন রক্ষা করে এসেছে। জীবনকে বন্দী করে ওরা দেহের বিলাস আর মনের আরাম অর্জ্জন করেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল, পরপদলেহনের

আগ্রহ—আর পরাশ্রয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ জীবন রক্ষায় ওরা একনিষ্ঠ হয়ে সাধনাই করেছে। ওরা একবার ভাবতেই চায় নি,—ওদের জীবন-দেবতা কোনো দিন প্রতিশোধ নিতে পারে—কোনো দিন কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে—কেন এমন করে জীবন রক্ষা করেছে! ওরা অপরাধী—ওদের আত্মার কাছে অপরাধী, যে আত্মাকে ওরা বিক্রী করেছে—বন্ধক দিয়েছে—সেই আত্মা আজ প্রতিশোধ নিচ্ছেন—ওদের মরতে দেবেন না। মৃত্যুর আশীর্ব্বাদ পেতে দেবেন না—তাই কঙ্কালের মধ্যেই ওদের জীবনকে বন্দী করে রেখেছেন!

কিন্তু অপরাধ কি ওদেরই? হ্যাঁ, ওদেরই; ওদেরই পূর্ব্বপুরুষের, ওদেরই বংশধারার, ওদেরই গতজন্মের, ইহজন্মের। ওদেরই মধ্য থেকে ধনী হয়ে কেউ ওদেরই খাবার আত্মসাৎ করেছে, ওদেরই মধ্যের কেউবা ক্ষমতার গর্ব্বে অন্ধ হয়ে ওদেরই মুখের গ্রাস বন্ধ করেছে। ওদেরই মধ্যের কেউ হয়তো এই মন্বন্তরের সুযোগে ধনী হয়ে উঠলো। ওরাই অপরাধী—ওরা, ঐ যারা মরবার জন্য ব্যাকুল চীৎকার করছে, অথচ মরতে পারছে না! প্রতিশোধ!—জীবনদেবতার নির্ম্মম প্রতিশোধ"—ঠিকই লিখেছে তারণ ঠাকুর!—রাজু আরো এগিয়ে এল। গোটা দশ-পনের মৃতদেহ এদিক ওদিক গড়াচ্ছে—বৃষ্টির আগে, হয়তো দিনের বেলা রোদের ভয়ে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল এই ফাঁকা বারান্দায়। ওদের শাস্তি হয়ে গেছে; ওরা মুক্তি পেয়েছে। জীবন-দেবতা সার-বন্দী করে ওদের মরণের বীথিকায় সাজিয়ে দিয়েছেন! বাঃ, চমৎকার বিচার তো তাঁর!—রাজু নমস্কার করলো হাত তুলে। ওরাই ওদের জীবনের জন্য দায়ী ছিল,—ওরাই ওদের মরণের জন্য দায়ী হয়ে রইল। ওদের বিচার হয়ে গেছে—মৃত্যুদণ্ড! ওরা অখাদ্য খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে—ভিক্ষা করে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে—না-খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে—তবু অধর্ম্ম করেনি, অপকর্ম্ম করেনি, অনিষ্ট করেনি কারো। যাদের গোলা-ভরা ধান আর

বস্তা-বোঝাই আটা-ময়দা টাকার বানভাসী এনে দিল—ওরা তাদের শক্তির কাছে শুধু কাতর চোখে চেয়ে থেকেছে; তাদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করেনি পর্য্যন্ত! ঐ ওদেরই মধ্যে যারা অর্থের অপব্যয়ে আজ অজর—অমর বলে ভাবছে নিজেদিকে—এই মৃতদেরই আত্মীয় তারা—ভাই, সহোদর ভাই, এক দেশমাতার গর্ভজাত ভাই—তারা নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিকল্পে তাকিয়ে দেখল এই মরণের মাধুর্য্য, আদালতে যেমন করে বিচারাধীন আসামীকে দেখে কৌতূহলী জনতা!

কারো কারো আবার বাহাদুরী নেবার সখ আছে। সাউখুড়ি করে তারা লঙ্গরখানার লম্বাচওড়া খ্যাতি অর্জ্জন করে নিল। পুণ্যিও সঞ্চয় করে নিল কিছু। ওরা ভেবে দেখল না, এই মহিমময় মৃত্যুর জন্য দায়ী ওরাই। জীবন-দেবতার এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে যারা মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি পেল—তারা মুক্তিই পেয়ে গেল, কিন্তু তাদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে যারা জীবনকে রাখল বন্দী করে—জীবন-দেবতার রুদ্র রোষ, সূক্ষ্ম বিচার তাদের ছেড়ে কথা কইবে না—তারাও সব একদিন সমান হয়ে যাবে—সমতল হয়ে যাবে—শ্মশান হয়ে যাবে!

শ্মশানই তো—শ্মশানেই এমনি করে সব সমান হয়ে যায়। মরণের শ্মশান নয়—জীবনের শ্মশান—। জীবন সেদিন মানবজগতকে সমতলে নামিয়ে আনবে—আনবেই। জীবনের সাধনা, বেঁচে থাকার সাধনা—বেঁচে থাকবার জন্য বড়র আওতা সে রাখবে না—তার নিজের পুষ্টির জন্য বড়কে সে নির্ম্মূল করে দেবে, যেমন করে নদীর কিনারার শরঝোপগুলো সমস্ত বড় গাছকে নির্ম্মমভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। অমনি করে জীবন একদিন যুদ্ধ করে সবকে সমান করে দেবে, শ্মশান করে দেবে। শ্মশান—মানে সব যেখানে সমান। যে পুণ্যভূমিতে ধনী-দরিদ্রের, বড়-ছোটর—পণ্ডিত-মূর্খের তফাৎ নাই।—

কিন্তু তা কেমন করে হবে?—তারণ ঠাকুর লিখেছে, "তা হবার নয়"—নয়ই তো! রাজুরও তাই মত। সব সমান হতে পারে না—হয় না কখনো! বড় বাবুর মায়ের চিতায় ডুমণ চন্দন কাঠ পোড়ে—মাখনের চিতা গোটা কয়েক তাল-বাগডো দিয়ে রচনা করা হবে। গিরীশ পণ্ডিতের চিতাব উপর একটা ইটের স্তূপ তুলছে গাঁয়ের ছোকরারা—এই রকম আর একটা স্তূপ—ঐ খদ্দর পরে বক্তৃতা করতো, কি যে নাম—মহেন্দ্র বাবু—তার চিতায় তুলবার জন্য নাকি চাঁদা তোলা হচ্ছে। শ্মশানেও তো সব সমান হয় না তা'হলে! হতে পারে না! সব সমান হবে কি করে? সবাই কি আর মধু গনের মত ব্যবসা করতে পারে—না, গঙ্গা ময়রার মত জিলেপী বানাতে পারে! রামু ছুতোর কাঠের এককেটা কাজ করে যেন কাশ্মীরী কাজ—আর কেউ পারে না যে অমন! কাশী বাঁড়ুয্যে যে রকম করে সুদ আদায় করতে পারে—দশটা টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে দু শ' টাকার দাবী দিয়ে লোকের ভিটেমাটি নীলেম করে নিতে পারে—আর কেউ যে অমন পারে না গাঁয়ে! আবার বাবুদের ছোট বৌমা নিজের পাতের ভাত তুলে লোকের মুখে ধরে দেয়—উপোস থেকে। লুকিয়ে লোকের আঁচলের খুঁটে চাল বেঁধে দেয়—আর কে দেয় অমন! হুঁ—সমান হবে—না আরো কিছু! —ঠিক লিখেছে তারণ ঠাকুর—কোন্ দেশে নাকি সব সমান হবার চেষ্টা হচ্ছে। সে হয়তো স্বাধীন দেশ; সে দেশের সবাই হয়তো এ ওর দুঃখ দেখে—না দেখলে পাপ হবে মনে করে—না-হয়তো আইনে শাস্তি হতে পারে—আর না হয়, অন্য কিছুর লোভ দেখিয়ে সব সমান করা হচ্ছে। ইখানে তা কি করে হতে পারে মশাই? কোনো মানুষ লোভী, কোনো মানুষ রাগী, কোনো মানুষ চোর—কোনো মানুষ সাধু। কেউবা লম্পট, কেউ আবার পরের মেয়েকে মা মনে করে। এই সবকে এক করে দাও; সব সমান কর! ঐ

কারখানার মালিকরা আর মজুররা সব এক সারিতে পাতা পেড়ে ভাত খাবে—হুঁ, যত আজগুবি! তবে হ্যাঁ—সমান করতে পারে একজন—মৃত্যুরাজ—যমরাজ—রাজাধিরাজ শমনরাজ! ওর কাছে কারো চালাকীর যোটি নাই বাবা! সাত পুর গদীপাতা বিছানাতে শুয়েই মর—আর গো-ভাগাড়ে পড়েই মর, মরতে তোমাকে হবেই; উখেনে বাবা এড়ান নাই। সব সমান যদি কেউ করতে পারে তো ঐ একজন—শমনরাজ!—ঐ তো—ঐতো মরলো! আহা, গেল—হয়ে গেল! ও মুক্তি পেয়ে গেল। বাপ্‌রে! কী কষ্ট যে পাচ্ছিল ও! আহা, মরে জুড়ুলো—কিন্তু আর একটা ধুঁকছে, এখনো ওর শাস্তি শেষ হয়নি—ওব পাপ এখনো রয়েছে!—'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'—শুনুক, শুনুক একটু ঠাকুর-নাম—যদি ওর পাপটা ক্ষয় হয়ে যায় শীগ্‌গির—হরিবোল—হরিবোল—জয় বাবা তারকনাথ—!

একটা খেঁকী কুকুর—হয়তো পিঠে ঘা হয়েছে—চেঁচাচ্ছে। মরবে বোধ হয়! মরুক—মরে জুড়োক। ও-ও তো খেতে পায় না—ওরও পাপ আছে! আছে বৈকী। নইলে পায না কেন খেতে? জীবন-দেবতা ওকেও বাদ দেবেন না শাস্তি থেকে, রেহাই নাই—ও এত কাল মানুষের দুয়ারে দাসত্ব করে জীবন রক্ষা করে এসেছে—সেই ওর পাপ! ও অনায়াসে বনে চলে যেতে পারতো—বন্য হয়ে যেতে পারতো। বেঁচে থাকবার জন্য ওর দাসত্ব করার দরকার ছিল না কিছু। ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ের মেয়েগুলোর খাবারের ঠোঙা চেটে ও এতকাল কেন বাঁচলো? সেই ওর অপরাধ! ও মরুক—মরে জুড়োক। ওর দাসত্বের জীবন শেষ হোক—এবার যেন স্বাধীন দেশে জন্মায়—স্বাধীন হয়ে যেন জীবনের উপাসনা করে—ঐ কুকুরটা, এই মানুষগুলো—এই এরা সব, যারা মরলো! জীবনকে রাখবার জন্য তারা যেন জীবনেরই পুজো করে—সুস্থ, সবল, স্বাধীন জীবনের—যে জীবন নিষ্পাপ করে তাদের বাঁচিয়ে

রাখতে পারবে। যে জীবনকে বেঁচে থাকার দাসত্ব করতে হবে না শৃঙ্খলিত হয়ে—বন্দী হয়ে!

কুকুরটা তো এখন মরবে না—ওর পাপ অনেক বেশি! কিন্তু ঐ দ্বিতীয় কঙ্কালটা মরছে! জল খাবার জন্যে হাঁ করছে যে! এখনো জল খেয়ে ওর বাঁচবার চেষ্টা! আশ্চর্য্য! বেঁচে থাকার বাসনা কতখানি উগ্র? কী ভয়ঙ্কর এই বেঁচে থাকার সাধনা! দেবে নাকি এক আঁজলা জল রাজু! দিলে কী আর এমন মন্দ হবে? আরো খানিকক্ষণ বেশি বেঁচে থাকবে—খানিকটা বেশি শাস্তি ভোগ হবে ওর পাপের—যেমন লঙ্গরখানা খুলে কয়েক লক্ষকে কিছু বেশি জীবনের ভোগাস্তি ভোগান হচ্ছে! দিল রাজু এক অঁাজলা জল এনে। আহা, খাচ্ছে দেখ। গলায় গলছে না তবু কী তৃপ্তি! চোখ দু'টো যেন কথা কইছে আনন্দে! কাদাজল এক গণ্ডুষ, তাই কি রকম চেটে চেটে মধুচাটা করে খাচ্ছে! আরো খানিকক্ষণ বাঁচবে ও! ওব শাস্তিটা রাজু বাড়িয়ে দিল—অন্যায় করলো নাকি? পাপ করলো রাজু! কে জানে? ওর ভাগ্য-বিধাতাব এইটাই ইচ্ছে বোধ হয়। নইলে এত রাত্রে রাজু এখানে আসবে কেন!

রাজু ফিরলো! সারি সারি মডা পডে আছে কযেকটা—একটা ছেলের গায়েব খানিকটা ঐ খেঁকীটা খেয়েছে। দু'টো শিয়াল একটাকে নিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসেছে! বেশ আছে ঐ শেযালগুলো! ওরা জীবনের জন্য কারো দাসত্ব করে না। জীবনই ওদের দাসত্ব করে। ওদের কাছে সেই যে কবিতা আছে—'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'… খাঁটি সত্য কথা! জীবন দেবতা ওদের উপর প্রসন্ন—ওদের প্রচুব খাদ্য দিচ্ছেন—পরম যত্নে রেখেছেন। ওরা বনের স্বাধীন জানোয়ার—কুক্কুরের মত দাসত্ব করে না মানুষ-রাজার। পাত চেটে জীবন রক্ষার চেষ্টা করে না—না পেলে না খেয়ে মরে—তবু লোভী মানুষের

দ্বারস্থ হয় না। ওরা জীবন-দেবতার সত্যি উপাসনা করে—ওরা স্বাধীন!

ভোরের বাতাস বইছে—চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস, ফুলের গন্ধ মেশানো বাতাস! ধরিত্রী-রাণীর কুসুম-বাসর শেষ হল—চাঁদ-বর এবার চলে যাবেন। ঐ পশ্চিমের ধান ক্ষেতের ওদিকে তিনি বিদায়ী সম্ভাষণ জানাচ্ছেন রাত্রিকে! রাত্রিও এবার লুকিয়ে পড়বে কচি, নব-বিবাহিতা বধূর মত, কিন্তু দিনের অভিসার-কাল আসন্ন—আসন্ন ময়নারও অভিসার-কাল—! রাজু চমকে উঠলো। উঠেছে এতক্ষণ ময়না, অভিসারে যাবার সব আয়োজন করছে হয়তো। ময়নাও যাবে অভিসারে—কিন্তু কার কাছে? সে তো সূর্য্য নয়—সে যে পঙ্ককুণ্ডের অধিবাসী একটা বিষাক্ত সাপ। তবু ময়না যাবে,—যাবে সেই সাপের বিষ পান করতে। ওহো—ও! না—ময়নাকে আর যেতে দেবে না রাজু আজ! ত্বরিতে ফিরে এল রাজু ঘরে। ময়না সত্যি উঠেছে। উনুনে কি চড়িয়েছে! রাজু বলল—তুর গা' ভাল নাই ময়না—আজ আর যাস নে!

—দেখি, বারুও তো এল না আথুনো!

—এলেও যাবি না তু!—ময়না চুপ করে রইল।

রাত্রি শেষের পাখীর কাকলী ছাপিয়ে কান্নার কলরোল উঠলো অকস্মাৎ! সদ্যমৃত আত্মীয়ের জন্য শোকার্ত্ত পরিবারের পরিবেদনা—, মন্দাক্রান্তা ছন্দে ক্রন্দন! কোথায় কে আবার মরলো হয়তো! কান্নাটা অনেক দূর থেকে আসছে—তাঁতীপাড়ার ওদিকে নয়, বোরেগী পাড়ার দিক থেকেই আসছে শব্দটা। ময়না কুঁড়ে থেকে বাইরে এসে কাণ পেতে শুনলো খানিকক্ষণ, তারপর বলল—কে জানে গা কে আবার মলো!

রাজু একটা দাঁতন কাঠি দিয়ে দাঁত ঘসছিল, বলল—মরুক—যা তুই

চা কর। মরছে তো সবাই; উ আর ভেবে কি করবি! মাথন জ্যেঠাকে পুড়াতে হবে—যা চট্ করে!

—আজ তাহলে খাটতে যাব না দাদা—লয়? থাক গা!

—না, তুর গা' ভাল নাই। আব বারুণীও তো আসলো না আখুনো—থাক গা!

ময়না আর কোনো কথা না বলে ঘবে ঢুকে খান কয়েক রুটি সেঁকলো! বাজু ইতিমধ্যে মুখ ধুয়ে এসেছে। একখানা চিনেমাটির ছককাটা প্লেট—একটা ভালো কাচের গ্লাস—একটা ভালো কাপ ধুয়ে ময়না দাদার জন্যে চা রুটি এগিয়ে দিল!

—ই গুলন পেলি কুথা?—শুধুলো বাজু খেতে খেতে!

—ঐ উখেনেই। মিলা জিনিষ দাদা—উদেব কি কিছু অভাব আছে! বাজা সব উরা!

—হুঁ—! রাজু চা দিয়ে রুটিটা গলিয়ে নিল—আটকে যাচ্ছিল যেন!

—তুর মুনিবের নামটো কি ব্যা ময়না?

—ঠিকেদার সাহেব। কেনে দাদা?- নাম নিয়ে কি করবে?—ময়না যেন ভয় পেয়েছে একটু!

—করবো কি আব! এমনি শুধুইছি! দেখতে ক্যামোন? চেহাবা ভালো তো?

—হুঁ—দেখতে যেন রাজপুত্তুর! তবে লুক ভাল কি না কি করে জানবো দাদা!—ময়না যেন আশ্বস্ত হোল!

—একদিন যাব দিখা করতে!

—হুঁ! তুমি যেমন দাদা, দিখা করবে! উওদেব বলে সেই সায়েবী মিজাজ! না দাদা—যেও না!

রাজু চা-খাওয়া শেষ করে বলল,—লে, খেয়ে লে, তা-বই চল' জ্যেঠাকে পুড়াতে হবে!

—হুঁ—ময়না খেতে লাগল! সকাল হয়ে গেছে। ময়না তার ছেঁড়া কাপড়খানা অতি যত্নে এমন করে পরেছে যে তার মুখ-হাত-পা ছাড়া কোথাও আর কিছু নজরে পড়ে না। রাজু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে আর একবার দেখে নিতে চাইল এই দীপ্ত দিবালোকে। গ্রামের পূর্ব প্রান্তে ওদের বাড়ী, কাজেই প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম অভিনন্দন ওদেরই উঠোনে এসে হাসতে থাকে! দাদাকে তাকাতে দেখে ময়না আরও গুটিয়ে গেল। কুঁকড়ে উবু হয়ে খেতে লাগল। রাজু নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে মাখনকে পোড়াবার আয়োজনে লাগল গিয়ে। খাট নাই, বাঁশও নাই বেশী; কয়েকখানা তালবাগড়ো রয়েছে; রাজু সেইগুলো একত্র করে একগাছা খড়ের লেয়ালী-দড়ি দিয়ে বেঁধে মাখনকে টেনে বার করলো ঘর থেকে! তালবাগড়োগুলোর উপর মাখনের দেহটা রেখে আবার বাঁধলো দড়ি দিয়ে—তারপর ময়নাকে বলল—তুখে যেতে হবে না!

—তুমি ইকা লিয়ে যেতে পারবে কেনে দাদা?

—ছেঁচড়ে লিয়ে যাব। দে, চাট্টি কাঠ দে।

—না দাদা, চল, কাঠ আমি লিয়ে যাই!

—না!···রাজু সুদৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো—কথাটা ধমকানির মত শোনালো ময়নার কাণে।

ময়না নিশ্চুপ হয়ে গেল। দাদার মুখ থেকে ধমক ও কখনো খায় নি। দাদা ওর পরম স্নেহশীল মানুষ। ময়না এক বোঝা শুকনো কাঠ দিল। সেগুলোও ঐ তালবাগড়োর উপর বেঁধে নিয়ে রাজু ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো মাখনের মৃতদেহ! শব্দ হচ্ছে একটা ছড়-ছড় করে। উপরে আকাশে হাউই-জাহাজ গেলে যেমন শব্দ হয়—ঠিক তেমনি। নীচে মাখনও যেন তালবাগড়োর জাহাজে স্বর্গে চলেছে! বৃদ্ধ মানুষের শীর্ণ দেহ। রাজু অবাধে টেনে নিয়ে চলল; এল নদী কিনারে শ্মশানে।

কয়েকটা বাবলা-গাছের ফাঁকে ফাঁকে মানুষের অন্তিমদিনের অঙ্গার পড়ে আছে! ওরই একটায় মাখনকে তুলে জ্বালিয়ে দেবে রাজু—কিন্তু আরও একটা কাকে যেন পোড়াতে এনেছে—ঐ ওদিকে খানিকটা দূরে। কে আবার মরলো। ও—! যারা কাঁদছিল সকাল বেলা, তাদের কেউ। কিন্তু কে?—রাজু মাখনকেও টেনে নিয়ে ঐ দিকেই এগিয়ে গেল! একটা ছোট টীলার আড়ালে ডোবামত যায়গা, সেইখানেই চিতা সাজানো হয়েছে—আর চিতার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে ঈশান! আহা! ঈশান তাহ'লে মরে গেল! মুখাগ্নি করবে গোলাপী, কিন্তু ভীষণ কাঁদছে মেয়েটা—"ওগো রাজা আমার গো, আমাকে ছেড়ে কুথা চল্লে গো…"! করুণ একটানা কান্না। কাঁদছে আধবুড়ি সেই মা মাগীও! ঈশানের জন্যে বুক ওদের ফেটে যাচ্ছে নাকি! মাখনকে ছেড়ে রাজু খানিকটা আরো এগিয়ে এল! মড়াটা যে ক'জন বয়ে এনেছে তারাই জ্বালাবার সব ব্যবস্থা করছে। সকালের রোদের আলোতে ঈশানের ফর্সা রং কেমন যেন নীলাভ দেখাচ্ছে, মুখখানা হাঁ হয়ে রয়েছে, কিন্তু নীল! ভালো করে তাকিয়ে দেখলো রাজু—নীল—নীল হয়ে গেছে ঈশান। কী মনে করে ও যেন চমকে উঠলো। মুখাগ্নি সেরে গোলাপী ইতিমধ্যে সরে এসেছে। দাউদাউ করে চিতা জ্বলে উঠলো! ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ঈশানের দেহখানা। যাক্—আর যারা মরেছে বা মরছে তাদের ক'জনাই বা আগুন পাচ্ছে? ঈশান তবু পেল, আর পেল ওর বৌ-এর হাতেই; সহধর্ম্মিণীর হাতেই। কাল সন্ধ্যায় শোনা কুন্তীর কথাগুলো মনে পড়ে গেল রাজুর। সহধর্ম্মিণী—হাঁ, বিয়েলি বৌ তো গোলাপী ওর; কিন্তু নীল রং—এত তাড়াতাড়ি লাস জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা—রাজুর কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। বিষ দিয়ে হত্যা নয় তো? কিন্তু ঈশানের মাও কাঁদছে! রাজুর হঠাৎ মনে পড়ল—বুড়ি ঈশানের সৎমা, গর্ভধারিণী নয়। ওঃ, তাহলে বিষ খাইয়েই গোলাপী পথের কাঁটা দূর করে দিল; এবার বেঁচে থাকবার সাধনা করবে নাটুকে নিয়ে। বাঃ।

রাজুকে দেখে গোলাপী ছুটে এল—"কি হোল আমার—কি হোল রাজু দাদা গো···"

"থাম হারামজাদী নচ্ছারী—তুর সব গুণের কথা জানা আছে আমার"—রাজু মনে মনে আওড়ালো। ঈশানের মাও বলছে—"ওরে বাবা রাজু—তুর খেলার সঙ্গীকে ডেকে আন গা বে·· ও বাবা রাজু, আমার ঈশেন কুথা গেল রে···। রাজুর সমস্ত অন্তর বিষাক্ত হয়ে উঠলো এক মুহূর্ত্তে। পায়েব কাছে গোলাপী কাঁদছে, রাজু প্রচণ্ড একটা পদাঘাত করে ফেলল তার পিঠে—ভাগ হারামজাদী কুথাকার! রংতামাসা পেইছিস। বিষ খাইলি নিজেব হাতে!—কতকটা আকস্মিক ভাবেই থেমে গেল গোলাপী। জলভরা চোখ তুলেই কাটা-কাটা কথায় বলল—ই সব কি বলচো রাজু দাদা—ই সব কি কথা তুমার!

রাজু কোনো কথা না বলে মাখনেব দেহটা টেনে নিয়ে চলে এল নদীব বালির উপর! দেশলাই কাছেই ছিল, জ্বালিয়ে দিল মাখনের দেহখানা। এই কয়েকটা·তালপাতায় সব দেহটা হয়তো পুড়বে না; যতটা পোড়ে পুড়ুক—রাজু আর অপেক্ষা করতে পারছে না! অজয়ের জলে নামলো স্নান করতে! ওর শিক্ষায়-অভিজাত মন সইতে পারছে না যেন আর এই ভণ্ডামী।

গোলাপীর বাবা, ভাই, আর ঈশানেরই এক কাকা ঈশানেব দেহটা পোড়াচ্ছে। দেহখানা কুঁকড়ে উঠছে আগুনেব তাতে; হাত-পাগুলোব শিরায় টান ধরায় মড়াটা উঠে বসতে চাইছে। মোটা একটা বাঁশ দিয়ে সেটাকে চেপে ধরলো ওরা। দুম্‌দাম বাড়ী মারতে লাগলো ঈশানের দেহেব উপর—দেখতে পাচ্ছে রাজু। ঈশানকে ওরা নিঃশেষ করে পুড়িয়ে ছাড়বে, একেবারে ভস্ম করে দেবে ঈশানের দেহ! ওদিকে গোলাপীর শাঁখা-নোয়া ভাঙবার জন্য ঐ বুড়িটা ওকে টেনে নিয়ে আসছে অজয়ের জলে, রাজুরই কাছ দিকে! রাজু জলে নেমে গেল। স্নানটা সেরেই ও পালাতে চায়।

অজয়ের জল বেড়েছে কিছুটা। কাল রাতের বৃষ্টির জন্যই হয়তো! ময়না আজ নদী পার হয় নি—ভালই হয়েছে। ময়নাকে শ্মশানে আনলো না রাজু। আনলে হয়তো মাখনকে ভাল করে দু'জনে পুড়িয়ে দিতে পারতো। কিন্তু না—ময়না অন্তঃস্বত্বা। শ্মশানে আসা ওর এখন বারণ—রাজু ডুব দিল জলে! "গঙ্গা গঙ্গা! মাগো পতিত পাবনি"—রাজু স্মরণ করলো মাতা ভাগীরথীকে। সর্ব্বপাপ সংহন্ত্রী, সব্বদুঃখ বিনাশিনী মা গঙ্গার কোলে মিলেছে গিয়ে এই অজয়। রাজু উঠে আসছে,—ওদিকে কী ভীষণ কান্নাই না জুড়েছে গোলাপী! উঃ, খামোখা মানুষ এমন করে কাঁদতে পারে! এত চোখের জল ফেলতে পারে মিছেমিছি! এমন নিরুপম অভিনয় করতে পারে মানুষ! হ্যাঁ, ঈশানের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে গোলাপীর কান্নাটাও স্বাভাবিক হোত! কিন্তু একি কান্না! নদীর সাদা-বালীর উপর গড়িয়ে গড়িয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে চীৎকার। দূর করো! রাজু গট্‌গট্ করে ফিরতে লাগল। ময়না ভাবছে হয়তো—দাদা ওকে শ্মশানে কেন সঙ্গে নিল না—দাদা যে সব জেনে ফেলেছে বোনটি; শ্মশানে তোকে আর আনবে কি করে!

কিন্তু ময়নার গর্ভে আছে একটা জারজ সন্তান! তার উপর এত মায়া-মমতা কেন রাজুর? তাকে তো নষ্টই করে দেবে, ভেবেছিল কাল! ঐ ঈশানের মা-মাগী জানে নানান রকম তুকতাক—তারই সাহায্য নেবে, ভেবেছিল রাজু। নাঃ, কেন নষ্ট করবে ময়নার ছেলেকে! সে তো শুধু সেই না-দেখা ঠিকাদারের নয়—ময়নারও ছেলে সে! ঐ শিশুর দেহ গঠনে ময়নারও অংশ আছে। তিলতিল করে লালন করছে ময়না তাকে; দাদাকে লুকিয়ে লালন করছে। তাকে রাজু নষ্ট করে দেবে? না। ময়নার ছেলে রাজুর পরম স্নেহের ধন—হোক সে ছেলে যারই হয়—সে তো ময়নারও ছেলে! রাজু নিশ্বাসটা জোরে ফেলে হাঁটছে জোরেই!

গোলাপীর কান্নাটা কি বীভৎস শোনাচ্ছে! এতটুকু মমতা জাগছে না রাজুর! ঐ হারামজাদীরা শ্বাশুড়ী-বৌ মিলে নাটুর সহায়তায় ঈশানকে

বিষ খাইয়ে মারলো—রাজুর আর এতে কোনো সন্দেহ নাই। পুলিশে খবর দিতে পারতো রাজু, কিন্তু কি হবে খবর দিয়ে! লাস তো জ্বালিয়ে ছাই করে দিল এতক্ষণ! আর মরছে বেবাক লোক—না খেয়েই মরছে—ঈশানের মরণটাও ঐ না-খেয়ে মরাদের দলেই পড়বে। যাক গে। রাজু কুঁড়েব কাছে এসে পড়ল।

ময়না উনুনে রান্না চাপিয়ে তারণ ঠাকুরেব বইখানা উল্টাছে; পডছে নাকি!

—পড়ছিস বোনটি?

—হুঁ। ইয়েব মধ্যে জ্যেঠা পুডে গেল দাদা! এত শিগ্‌গি?

—না মনি, ঐটুকু কাঠে কি পুডে। যতটা পুডে পুড়ুক—ভেবে, মুখে আগুন দিয়ে চলে এলোম!

—বেশ হলো! মরছে তো হাজার লুক, কে কত পুড়াবে বাবা। লাও, কাপড ছাড!

ময়না রাজুকে কাপড দিতে উঠলো। ছেঁড়া লুগাটাই ময়না এখনো পরে আছে, অথচ ওর সেই পাতলা নীলাম্বরী শাড়ীটা শুকিয়ে গেছে—পরতে পারে এখন। কিন্তু সে শাড়ী খালি গায়ে পরা চলে না, দিনের বেলা—তলায় সেমিজ চাই! রাজু দেখলো—ময়নার পরিপূর্ণ যৌবন ছেঁড়া কাপড়খানায় আটকাচ্ছে না—অসামাল হয়ে উঠেছে ও, আর দাদার সম্মুখে বিব্রত হ'য়ে পড়েছে। নিজের ধুতিখানা পরে রাজু মাখনের ঘবে পাওয়া টাকা ক'টা নিয়ে বলল—তুর লেগে একটো কাপড কিনে আনি গা তাঁতী ঘরে—ইটো বড্ড ছিঁড়ে গেইছে!

—হুঁ!—ময়না নিজের অঙ্গ সম্বৃত করতে চেষ্টিত হচ্ছে। রাজু বেরিয়ে যাবে, ময়না তাড়াতাড়ি বলল—

—কিছু মুখে দিয়ে যাও দাদা—পিথম একটুকু নিমপাতা, তা' পর দু'টি মুড়ি আর জল—লাও!

মড়া পুড়িয়ে ফিরে এসে নাকি এই সব খেতে হয়—নাহলে অমঙ্গল হয়। অমঙ্গল, কচু! কি আর হবে অমঙ্গল! রাজু গ্রাহ্য করতে চায় না অমঙ্গলের কথা! কিন্তু ময়নার যদি কিছু অমঙ্গল ঘটে। অমঙ্গলের ভয়ে রাজু ময়নাকে শ্মশানে নিয়ে গেল না! রাজু ফিরলো।

—দে কি দিবি!

ময়না খাবার দিতে দিতে বলল—অমনি বারুর খবরটো এনো দাদা—উ কেনে এল না আজ! কাল দু'জনাতেই খুব ভিজেছিলোম। জ্বরটর আবার হোল না তো?

—হুঁ—দেখে আসছি।—রাজু বেরিয়ে গেল। ময়না অনেকক্ষণ চেয়ে রইল বাইরের নদীর দিকে। বাঁশবন, ঘাসবন, কাশবন—তার পরই বালু-বেলা—মাখনের চিতাধূম ক্ষীণতর হয়ে আসছে। আর দেখা যাচ্ছে না ধোঁয়া! ময়নাকে ওর দাদা নিয়ে গেল না কেন শ্মশানে। সন্দেহ করেছে নাকি কিছু? হয়তো করেছে, হয়তো…! ময়না আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। দাদা যদি জানতে পেরে থাকে, তাহলে কি করবে ময়না? কি করে লুকোবে?—না, লুকোবার আর উপায় নাই, জানতে না পারলেও একদিন পারবেই। বেশী দেরীও নাই আর। ময়না কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ!

রাজু ভাবতে ভাবতে চলেছে—মোটা তাঁতের কাপড় একখানা কিনে নেবে। লাল পাড়—চওড়া আঁচলা দেখে কিনবে—বেশ মানায় ময়নার গায়ে। কাল কিচ্ছুটি খেল না মেয়েটা! ওর হয়ত অরুচি করেছে—হয়ত টক-ঝাল খেতে ইচ্ছে করে। হয়ত ভাল রান্না করা তরকারী খেতে মন যায়! তারণ ঠাকুরের বাড়ী বলতে যাবে নাকি রাজু—নাঃ, ফিরবার পথেই বলে যাবে ময়নার জন্যে আজ যেন বৌমা ভাত তরকারী দেয়। বৌমা রাঁধে ভালো—কাল খুব ভালই খেয়েছে রাজু ঐ তারণের বৌয়ের হাতের রান্না। রাজু গট্‌গট

করে হেঁটে উদয় তাঁতীর ঘরে ঢুকলো—কাপড় আছে হে উদয়কাকা? দাও তো একটো বড় আঁচলা—লালপাড়!

—ময়নার লেগে?

উদয় ময়নার ব্যাপারটা জানে, একটু রসিকতা করে বলতে চাইছিল, "সাধভক্ষন নাকি হ্যা"—কিন্তু রাজু এখন খদ্দের, তাই রসিকতার লোভ সামলে কাপড বের করে দিল। একখানা বেছে কিনে নিয়ে রাজু এগুলো কিষ্টর ঘরের দিকে—বারুণীরও খবর নেবে। আর যদি সুযোগ পায় তো চাট্টি আমড়া—আছে ঐ কিষ্টর ঘরের গাছে, নেবে ময়নার জন্যে। টক খেতে ভালবাসে ময়না!

ঘরে কেউ কোথাও নেই। কুঁড়ের দরজায় তালাবন্ধ। কচি আমের গাছটা ছাগলে খাচ্ছে। আমড়া গাছেও আমড়া নেই বললেই হয়—মগডালে পাঁচ-সাতটা রয়েছে, বাকি সব হয়তো বেচেই খেয়েছে কিষ্ট। রাজু কাপড়খানা নামিয়ে গাছে উঠলো! আমড়া কয়টা আঁচলে নিয়ে নেমে এল আবার। গেল কোথায় হতভাগা কিষ্টে! বিবাগী হয়েই গাঁ থেকে পালালো নাকি। হবেও বা। ময়নার দাদা রাজু—রাজু ময়নার যে দোষটা ক্ষমার চোখে দেখতে চাইছে, স্বামী-কিষ্টর পক্ষে বারুণীর সে দোষ ক্ষমা করা কঠিন—রাজু বোঝে তাই এসেছিল কিষ্টকে সান্ত্বনা দিতে! কিষ্টকে না পেয়ে রাজু বারুণীদের ঘরপানে চললো! বারুণীদের ঘরটা যেন পড়োবাড়ী—কেউ যেন কোথাও নাই! হোল কি ওদের? রাজু সন্তর্পনেই ঢুকলো উঠোনে। না, কেউ নাই! চলে আসবে কিনা ভাবছে হঠাৎ মানুষের কথা শুনতে পেল! বারুণীর মা বলছে—

—কি খাবি খা' ইবার—খা সব্বনেশে.! ছাই খা উনুনের! কারখানায় যেয়ে কি করতো কেউ দেখতে যেত না—আর ইখেনে তু' দিলি নেটো মুড়লের ভুগে লাগাঁয়ে! খা ইবার কি খাবি!

—মূড়ল যে ইমন করবে, তা কি আমি জানতাম! হায়—হায়—হায়! উঃ! শালা মূড়ল!

পুরুষের গলাটা কিষ্টর! রাজু ব্যাপারটা বিশেষ কিছু বুঝতে পারছে না! বারুণীর মা আবার বলল—

—জানথিস না, হারামজাদা! জানথিস না তু? গুলাপীকে নিয়ে কি কাণ্ড কচ্ছে নেটো—দেখছিস না খালভরা?

—মূড়ল আমাকে লোভ দেখাইল, একপাই চাল দিবে, ডাল-মুন-ত্যাল দিবে—থাকবো গোহালের ঘরে!

—বেশ! যা, ইবার থাক গা গোয়ালের ঘরে গরু হয়ে! এক পাই চালের লেগে নিজের বৌকে বিচলি তু! তু কি কম হারাম-জাদা রে আঁটকুড়ো! তু কি কম বজ্জাৎ—বেরো, বেরো ঘর থেকে! আঁটকুড়ো, আবার কাঁদতে এসেছে আমার কাছে!—যা, লিগা নাটু মূড়লের খপ্পর থেকে!

রাজু এবার বুঝতে পারছে—নাটু কিষ্টর সাহায্যে বারুণীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছে এবং সেখানে তার যা করবার করেছে। নির্বোধ কিষ্ট এতক্ষণে নাটুকে চিনলো! ব্যাপারটা আরো ভাল করে জানবার ইচ্ছে হচ্ছে রাজুর—কিন্তু লজ্জা করছে যেন! ওর বোনের ব্যপারটা আরো ঘোরালো—আর এরা সবাই তা জানে। তবুও রাজু এগিয়ে এসে বলল—কি হোল কিষ্ট? বারুণী কৈ?

আর কিছু বলতে হোল না—শুন বাবা রাজু—বলেই বারুণীর মা সালঙ্কারে রাত্রের সব ঘটনাই বলে দিল রাজুকে। বারুণী যে এখন বন্দী আর চাষী নাটুর কাছে—সেটাও বলতে ভুললো না। কিষ্ট দাঁড়িয়ে উঠে বলল—থানায় চললোম আমি।

—কিছু লাভ হবে না—রাজুই বলল—দারগা নাটুর বন্ধু, আর তুই শালা নিজেই বারুণীকে লিয়ে গেছিস। তু শালার আক্কেল হোক একটুস—রাজু সটান বেরিয়ে পড়ল তারণের বাড়ীর দিকে!

তারণ ঠাকুরের ঢেঙা বউটা কালকের পাওয়া চালগুলো ধুচ্ছে, ভাত রাঁধবে।

—বৌঠাকরোণ, বেশ সুময়েই এলোম! ময়নাকে আজ একবাটি পেসাদ দিতে হবে!

—বেশ তো। দি'ও পাঠিয়ে। এইখানেই খেয়ে যাবে—বৌ বলল। রাজু আমড়া ক'টা নামিয়ে দিয়ে বলল—দিদিঠাকরোণ কুথাকে গেল?

—টাকা এসেছে, সই করে লিতে গেল পুষ্টপিসে।

—আঃ, বেশ, তাহলে আমি বলছি গা ময়নাকে।—রাজু ওখান থেকে আবার ফিরলো। গাঁয়ের পথ—নির্জ্জন, স্তব্ধ পথ। কদাচিৎ কেউ হয়তো পথ চলছে!

—কাপড় কিনলি নাকি রে রাজু?—প্রশ্ন করলো দিদিঠাকরোণ। হাতে কয়েকখানা একটাকার নোট। পোষ্ট-অফিস থেকে ফিরছে। মুখে প্রসন্ন হাসি। ভাই-এর উপর সব রাগ-অভিমান জল হয়ে গেছে আজ—কত লিল দাম?

—তিনটাকা চার আনা, দিদি। লিবে একটো বৌটার লেগে?

—হুঁ, লিতে হবে। কাপড় একদম নাই। তা লিব কি করে, মোটে আটটি টাকা দিয়েছে!—দিদি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে; যেতে যেতে আবার বলল—দেখি, পারি তো লিব একখানা···। দিদি চলে গেল। রাজু বাড়ী ফিরছে। তারণ ঠাকুরের বৌ-এর কাপড় নাই। ওরা ভদ্রলোক, ওদের মত নিরুপায় আর কেউ নাই। না খেয়ে ওরা মরবে—তবু সম্মানটুকু নষ্ট হতে দেবে না! এই ওদের শিক্ষা, এই সংস্কার! ওরা বড়ো দুঃখী, বড়ো অসহায়। কয়েকজন একবোঝা কাপড় নিয়ে আসছে এই দিকে। ঢুকলো ঐ তারণ ঠাকুরেরই ঘর। কী ব্যাপার! বিলুবে নাকি? ফিরে এল রাজু দেখবার জন্য! নাটু মোড়ল বলছে—লাও দিদি! বৌটার লেগে

একখানা···বুঝলে! লিতে কিছু দোষ নাই। আমিই লিলোম দু'টো— লাও! তারণ এলে আমরা বলবো যে সুবাই লিয়েছে—লাও।

—না নাটু লিতে লারবো। আপনার ঘরে কচু পাতা আছে, মান পাতা আছে, তাই পরে থাকবে বৌ। দিতে আসাই তুর অন্যায় হয়েছে। তুই ভাই বড়লোক—তুর উসব লিলে চলে; আমরা গরীব, আমাদের রিলিফের কাপড় লিতে নাই।

—কিছু এমন দোষ নাই দিদি—আমি বলছি—লাও—নাটু আবার বলল।

—না,—দিদি সুদৃঢ় প্রতিবাদ করলো—এমন দিন থাকবে না আমার! আজকে কাপড় লিলে কাল বলবি, তারণ ঠাকুরের গ্যাংটো বৌকে তু' কাপড পরাইয়েছিস! সি কথা শুনবাব আগে যেন মরণ হয় আমার!

—কাপড় তো আমার লয় দিদি, সবকারী···নাটু বলল।

তা হোক গা। আমি লিব নাই—লিতে পারবো না।

নাটুর দল ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। রাজু ভাবতে লাগল, এরা, এই ভদ্রবা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, তবু এতটুকু নোয়াবে না! কোথায় পায় এরা এত শক্তি? রাজুইবা কেন পায় না? কেন সে ময়নাকে ও'কাজ করতে যেতে দিয়েছিল!

ওর অন্তর জুড়ে চীৎকার উঠছে আজ—কেন যেতে দিল, কেন তার মনের এতখানি দুর্ব্বলতা হল? না খেয়ে কি রাজু মরতে পারতো না? সে মরে গেলে ময়না যা ইচ্ছে করতে পারতো, রাজু দেখতে আসতো না। ওঃ! রাজু কেন ভেবে দেখে নি! না,—আর যেতে দেবে না রাজু; আজই যেতে দেয় নি—কোনদিন দেবে না।

কিন্তু যা-হবার, যতখানি অনিষ্ট হবার, হয়ে গেছে। বাকি আর এতোটুকু নাই।—কোন একটা জারজ ছেলেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়ে তুলছে ময়না—শরীরের সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে আগলে বাঁচিয়ে

রেখেছে—বাঁচিয়ে রাখবে। ময়নার কাছে সেই ছেলেটা হবে ময়নার আদরের সন্তান!

মাথার চুলগুলো হাতের আঙুল দিয়ে মুচ্ড়ে পাক দিয়ে রাজু স্বস্তি বোধ করলো কিছুটা! তার ঐ মাথাটায় এতটুকু বুদ্ধি নাই—, যাতে সে এই বিপদের কথা বুঝতে পারে—ধিক! রাজু কুঁড়ের কাছাকাছি এসে যতটা সম্ভব সহজ-স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলো; ময়না যেন না বোঝে যে রাজু জেনেছে; ময়না দুঃখ না পায়। দুঃখ দিয়ে আর লাভই বা কি? উপায় তো নেই।

—এতো দেরী কেনে হোল দাদা—কুথা ছিলে? —ময়না উঠান থেকে সানন্দে আহ্বান জানাল!

—বৌঠাকরোণকে বলে এলোম, তু আজ খাবি গা উখেনে। রাজু বলতে বলতে ঘরে এল!

—কেনে? তুমি কুথা খাবে তাহালে?—রাজুর আনা কাপড় খানা নিয়ে ময়না দেখতে লাগল খুলে!

—আমি একবার রূপশা চললোম। ইবেলা খাব নাই। কী রাঁধলি কি র্যা? —একটা বিড়াল খাবারে মুখ দিতে যাচ্ছে। কে জানে কি রেঁধে রেখেছে ময়না, খেতে না পেয়ে শুকিয়ে-যাওয়া বিড়ালটা তাই খেতে যাচ্ছে!

—আমি রাঁধি নাই দাদা, রাঁধা মাছ, টিনে ভরা থাকে। উরা সব খায়। কাল এনেছিলাম একটিন।

রাজু দেখলো, বাদামে' গড়নের একটা টিনের কোটোতে রান্নাকরা ছোট ছোট কয়েকটা মাছ। ঢাকনা খোলা দেখে বিড়ালটা কোথা থেকে এসে মুখ দিতে যাচ্ছে। ময়নার এত কষ্টের সংগৃহীত মাছ বিড়াল খাবে? রাজু রেগে উঠলো! হাতের কাছে শীল নোড়া পড়ে রয়েছে; নোড়াটা তুলে নিয়ে রাজু সজোরে ছুঁড়ে দিল বিড়ালটার দিকে। করুণ একটা শব্দ

করে আধমরা বিড়ালটা ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছে—ছুটতে পারছে না। না খেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে গেছে ও। খাবে কোথা থেকে? মানুষই খেতে পায় না, তা বিড়াল। ঐ হারামজাদার জাতও দাসত্ব করে "দুধু ভাতু", 'মাছু-ভাতু' খেতে এসেছিল। সুদিনে ওর মনিব—মাখন জ্যেঠার সেই বিধবা বৌমা অনেক দুধ-ভাত, মাছ-ভাত খাইয়েছে, আজ ওর কেউ নাই। দাসত্বের এই পরিণাম! তার চেয়ে ও হতভাগা তো বেশ স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারতো স্বাধীন ভাবে! ইঁদুর ধরে খেতো, গেঁড়ী-গুগ্‌লী কুড়িয়ে খেতে পারতো। কেন এসেছিল পোষা বিড়াল হতে?—মরুক।

—উম্-মা। কল্লে কি দাদা, মরে গেল যে! আঁহা-হা!—মরে গেল দাদা—হায়—হায়! বৌদির পোষা ছিল!

—মরুক! মরে যাক্! দে, ফেলে দিয়ে আসি।—রাজু টেনে নিল বিড়ালটার দেহ। বাইরে যাচ্ছে ফেলে দিতে।

—বেড়াল মারতে নাই দাদা—মা-ষষ্ঠী রাগ করে।—ময়নার নির্ব্বোধ কণ্ঠস্বর। চমকে উঠলো রাজু।

হ্যাঁ, বিড়াল মারতে নাই। বিড়াল নাকি মা-ষষ্ঠীর বাহন, মা-ষষ্ঠী সন্তান-দায়িনী, সন্তানের রক্ষয়িত্রী। ময়নার গর্ভে আছে সন্তান, তার অকল্যাণ হবে যে! এ কি করলো রাজু! বিড়ালটাকে মেরেই ফেললো! দুহাতে বিড়ালটাকে কোলের উপর ধরে রাজু ফু দিতে লাগল মাথায়, কানে—যদি বাঁচে, যদি বাঁচাতে পারা যায়, না হলে ময়নার ছেলের যে অকল্যাণ হবে!—জল, জল দে ময়না একটুস···!

—ফেলে দিয়ে এস দাদা, মরে গেইছে!—কথাটা বলেও ময়না জল দিল বিড়ালটার মুখে। নাঃ, বাঁচবার কোন লক্ষণ নাই। মরেই গেছে!—হে মা-ষষ্ঠি, কি করলোম্! রাজু আকুল কণ্ঠে বলে উঠলো। ময়না বলল—মরুক গা দাদা—উ মরতোই দু' একদিন পরে। দুঃখু করে কি হবে—যাও, ফেলে দিয়ে হাত ধুও!

রাজু কোনো কথা না বলে বিড়ালের দেহটা নিয়ে বাইরে এল। সেই শিরীষ গাছটার ছায়া-শীতল মাটি—পরম যত্নে রাজু ঘাসের উপর শুইয়ে দিল বিড়ালটাকে; গায়ে হাত বুলুতে লাগল—বাচ্‌—বেঁচে থাক!—মাথাটা কাঁপছে বিড়ালটার। তাহলে বেঁচেই আছে এখনো, বেঁচেই যাবে। বিড়াল চট করে মরে না। দাসের জাত যে, ক্রীতদাসের জাত কুকুর আর বিড়াল! স্বাধীন থাকবার সব রকম স্বযোগ ঈশ্বর ওদের দিয়েছেন, তবু ওরা দাসত্বই করবে। ঐ যে, ঐ মাছ-ভাত, দুধ-ভাত, গায়ে হাত বুলুনোর আরাম! বিড়ালটা মাথা নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে, রাজু ওকে আবার তুলে নিয়ে ঘরে ফিরলো—মরে নাই রে ময়না—বেঁচে গেল; এই লে! ময়না তখন নতুন কাপড়খানার আঁচলটা দেখছে ভাল করে। বিড়ালের সম্বন্ধে কোনো কথা না বলে বলল—ক'টাকা দাম লিল দাদা?—বেশ কাপড়টি; আঁচলটো ভারী সোন্দর!...

—পর! পরবি না আখুন?—রাজু বিড়ালটাকে ছায়ায় নামিয়ে দিয়ে বলল—পর বোনটি, দেখি কেমন লাগে?

ডুব দিয়ে পরে' বামুনদের ঘর যাব দাদা...আখুন থাউক!.. কাপড়টা ভাঁজ করছে ময়না। রাজু আর কিছু বলল না। ময়না একবার কাপড়খানা এখন পরলে খুসী হোত রাজু খুবই। সে এখনি রূপশা চলে যাবে। কাপড়খানা ময়নার গায়ে কি রকম মানালো, দেখতে পাবে না। কাল কুন্তির শাড়িটা রাজু দেখছিল, বেশ চমৎকার মানিয়েছিল কুন্তিকে। ঠিক তেমনি শাড়িই রাজু কিনে এনেছে। আচ্ছা, ফিরে এসেই দেখবে রাজু। শাড়িটা রেখে ময়না বলল—বৌঠাকরোণ রাঁধে খুব ভাল দাদা...চাট্টি পালং শাক, মূলো আর বেগুন এনেছি কাল; দিয়ে এসে গা কেনে? রাঁধা তরকারী তুমার লেগে লিয়ে আসবো—উবেলা খাবে...।

—যা কেনে তুই; ঘরে কুলুপ দিয়ে তু চলে যা। আমি তো চললোম রূপশা...যা তু...রাজু জবাব দিল। বিড়ালটা উঠেছে।

—চুরি-টুরি না হয় আবার ঘরে। মাথন জ্যেঠা ছিল, তবু দেখতো। ঘর দুয়োর ফেলে যাব দাদা ?—

—তা'বেটে। চুবি হোতে কত্‌খুন! না বোনটি, তু ঘরেই থাকিস, আমি চট্ করে ফিরে আসি রূপশা থেকে। মূলো-বেগুন কাল দিলেই হবে—রাজু তাডাতাড়ি ফতুযাটা গায়ে দিযে ভাঙা ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রূপশার দিকে।

ওর যাওযার পব ময়না কিছুক্ষণ বসে বইল চুপচাপ। দাদা যে কি জন্যে রূপশা গেল, তা ওর জানা। মকর ডোমের সঙ্গে মযনার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক আছে, সেটাই আবার ঝালিযে নিতে গেল। দাদা আর দেরী কবতে চায না, কিন্তু বর তো এখনো জেলে—না-কি ছাডা পেয়েছে? ময়না জানে না। খবর পায় নি। ছাডা যদি পেয়ে থাকে মকর তো এই শাওনেই বিয়ে হতে পারে। হলেই চুকে যায—কিন্তু নিশ্বাস ফেললো মযনা। বিয়ে কি আর হবে! হবার যে কিছুই আশা নাই! প্রায সাত মাস হয়ে গেল তার গর্ভে সন্তান এসেছে। লুকিয়ে কিছু কববাব আব কিছুমাত্র উপায নাই। পেট এঁটে শাডি পরে কত দিন আর লুকোবে মযনা! হয়তো জানতেই পেরেছে দাদা, আর না হয, জানবে আজ কিম্বা কাল। আজই তাকে যেতে হবে তারণ ঠাকুরের বাডী। তারণের দিদি আর বৌ দেখবামাত্র বুঝবে তার অবস্থা। নাঃ, যাবে না ময়না। কিন্তু না গেলেও উপায নাই। দাদা বলে এসেছে বামুন বাডীব পেসাদ নিবে। ঐ জন্যেই দাদা বোধ হয় পেসাদ চেয়ে এল—মযনার যাতে মঙ্গল হয়। ওঃ! দাদা—এখনো মযনাকে দাদা কত ভালোবাসে। জানতে পেরেও দাদা এতোটুকু কিছু বলল না। এমন দাদা আর হয় কারুর! ময়নার চোখ ফেটে জল গডিযে পডল!—দাদাকে সে প্রতাডিত করছে—!

কিন্তু উপায় ছিল না—ময়নার কোন উপায় ছিল না আব। ময়না তো মবতোই, দাদাও না খেয়ে মরে যেতো। তাব চেযে এই কবে দাদাকে

বাঁচিয়ে তো রাখতে পেরেছে। বেঁচে থাক দাদা, বেঁচে থাক। কিন্তু আর কয়দিনই বা মেয়াদ ময়নার। ঠিকাদার এখন অন্য কোনো নতুনের সন্ধানে আছে। ময়নাকে এবার একদিন ভাগিয়েই দেবে ও। কিন্তু ভয়ও আছে ঠিকাদারের ; ময়না যদি বড়সাহেবকে গিয়ে বলে দেয় তো ঠিকাদার মুস্কিলে পড়বে—কাজেই বেশি কিছু ময়নাকে বলে না। বয়স কম হলে কি হবে, দুর্ভাগ্যের শাণে ঘষা হয়ে ময়নার বুদ্ধি ধারালো হয়ে উঠেছে। ঠিকাদারেব কাছ থেকে বেশ কিছু আদায় করে তবে ময়না ছাড়বে তাকে—না হলে কাঁঠালের আঠার মতো লেগে থাকবে। হুঁ—হুঁ—চালাকী তো নয় বাবা—খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে ছাড় পাবে। ময়না সহজে ছাডছে না।

কিন্তু কী করতে পারে ময়না ? যদি না দেয়—যদি ভাগিয়ে দেয় ? ওবা বডলোক—ওরা সবই করতে পাবে। ওদের টাকার জোব আছে, ওদের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারে না। ভাগিযে দিলেই বা করবে কি ময়না ? না—তার চেয়ে ভালয়-ভালয় কিছু আদায় করে নিয়ে সরে পডবে। ময়না মতলব ঠিক করে ফেললো।

ভালো তালা আছে একটা , এনেছে ঐ কারখানা থেকেই। খুব শক্ত তালাটা। ওটাকে দরজায় লাগিয়ে ময়না মূলো, বেগুন আর পালং শাক নিয়ে বেরুলো বামুন বাডীব উদ্দেশে। ঘবে একা বসে থাকতে বিরক্ত লাগছিল ওর। তার চেয়ে তারণ ঠাকুবের বৌএর সঙ্গে দুটো গল্প করবে গিয়ে। খুব ভালোবাসে ওকে ঐ ঢেঙা বৌটা।

তারণ ঠাকুরের বৌ ডালভাত নামিয়ে কি রান্না করবে তাই ভাবছিল। সামান্য যা আলু-কলা আছে তাতে একজন লোকেরও হয় না—ও খুব মুস্কিলে পড়েছে। ময়না আবার খাবে—রাজু বলে গেছে—তাই ভাবনাটা এক বেশি। নিজেদের হলে ভাতে ভাতই খেয়ে নিত। দিদি কোথায় গেছে, হয়ত চাল কিনতে। টাকা আটটা এসেছে আজ—চাল কিনে না রাখলে আবার পাওয়া না যেতে পারে। বেলা অনেক হোল।

রাজু সকালে এসেছিল, বইটা তো কৈ ফিরিয়ে আনলো না? দেবে না নাকি বইটা আর ফেরৎ? বইটা একবার চোখেও দেখেনি বৌ। পড়তেও পারে না, কিন্তু ওর স্বামীর লেখা বই ওর বড় আদরের ধন। স্বামীর প্রত্যেকটি বইকে ও হাত বুলিয়ে আদর করে, আঁচল দিয়ে ঝাড়ে, কোলে নিয়ে বসে থাকে—মলাটের ছবিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে—আর ভাবে, কত কি কথা আছে এর মধ্যে; কত মেয়ের কথা, কত পুরুষের কথা, কত ছোট ছোট ছেলের কথা। ছেলে ওর হোলনা একটা। যদি হয় তো সে-ছেলে নিশ্চয়ই তার বাপের বই পড়তে পারবে—তখন ছেলের কাছে ও শুনবে, কি লেখে তার বাবা। ওর কথাও কিছু কিছু লেখে নিশ্চয়। হ্যাঁ লেখে, কিন্তু ও পড়তে পারে না—ভাত না খেয়ে থাকার চাইতে এ দুঃখ ওর কম নয়। তবু কেন যে ও লেখাপড়া শেখে না! এখনো কি শিখতে পারে না? নাঃ, হয় না আর। নিশ্বাসটা চেপে রাখতে পারে না—কান্না পায় ওর। বিবাহিত জীবনের সুখস্মৃতিগুলো মনে ভীড় করে আসে। যখন ওর বিয়ে হয়, তখন ওর বয়স ছিল সাত কি আট। শাশুড়ী কোলে করে নিয়ে সেই যে ঘরে ঢোকালেন তো এক নিমিষের জন্য চোখের আড়াল করতেন না। তখন ছোট মেয়ের ফ্রকের প্রচলন হয় নি পাড়াগাঁয়ে; ফেনাড়ী পরে ও বেড়িয়ে বেড়াতো। শাশুড়ী গুড-মুড়ি-খৈ-ঘি দিয়ে মেখে আঁচলে ভরে দিয়ে বলতেন—যা, খা গে ঘুরে ঘুরে। তারণের সঙ্গেই ও কত খেলা যে করতো! তারপর বড় হোল, শাড়ি পরতে আরম্ভ করলো, সেমিজ ব্লাউজ, পেটিকোট চড়ালো, মস্ত মেয়ে হয়ে উঠলো। তারণ তখন বিদেশে পড়তে গেছে। মাস কয়েক পরে অকস্মাৎ এক বাসন্তী পূর্ণিমায়—হ্যাঁ, দোলের দিনেই, সন্ধ্যাবেলা তারণ ঘরে এসে দেখলো, বৌটা লাজুকের একশেষ হয়ে উঠেছে। স্বামীর কাছে ও আর বেরুতেই পারে না। সর্ব্বাঙ্গে ওর বাসন্তী শ্রী ঝলমল করছে। ওর লজ্জা দেখে তারণেরও বোধ হয় লজ্জা হয়েছিল—তাই গভীর রাত্রে চুপি চুপি সেদিন কথা বলেছিল একটি মাত্র—ওকে ডেকেছিল নাম ধরে। অমন

করে তার পূর্ব্বে আর কখনো ডেকেছিল কিনা মনে পড়ে না, কিন্তু সেদিনের ডাকটি আজও তেমনি মধুর হয়ে আছে। সে-ডাক ও ইহজীবনে ভুলবে না। সেই ডাকটি শুনবার জন্য ও এত দুঃখ সয়েও বেঁচে আছে—বেঁচে থাকবে। সেই সুখের দিনের কিছু পরেই শ্বশুর গেলেন, শাশুড়ী গেলেন—দিনে দিনে দারিদ্র্যরাহু সংসারকে গ্রাস করলো। আজ একবেলাও ওর পূরো খাদ্য জোটে না—কিন্তু ওর আশা অবিনশ্বর। ওব স্বামী একদিন আবার সব সুখ ফিরিয়ে আনবে। এই আশায় ও বেঁচে আছে। ওর স্বামীর ভালোবাসাই ওকে রাখে সঞ্জীবিত।

—বৌ-দিদি?—নতুন কাপড় পরা ময়না এসে দাঁড়ালো উঠোনে। চমৎকার দেখাচ্ছে ময়নাকে, লক্ষ্মীর মতন।

—ওমা, ময়নামতী যে লো! আয়। উঠে বোস। বৌ ওকে সাদর আহ্বান জানালো। মূলো-বেগুনকটা নামিয়ে দিয়ে ময়না বসল রোয়াকের একধারে; বলল—দাদা গেল রূপশা; একলা ভাল লাগছিল না বৌদি।

—বেশ কল্লি, এলি। ই সব কুথা থেকে এনেছিস?

—ঐ যে গো, খাটুতে যাই না উপারে। ঐখানে পেলুম কাল…ময়না কুন্ঠিত হচ্ছে। বৌ অত লক্ষ্য না করে বলল—চাল-ডাল সবই দেয়, না লো?

—হুঁ, তেবে আব যাব না ভাই বৌদি। লুকগুলোন বড্ড খারাপ। দিদিঠাকরোণ কৈ? ডুব দিতে গেইছেন?

—না—চাল কিনতে গেল। আসছে আখুনি। কি খাবি বল দেখি? কি খেতে মন যায়? টক্—ঝাল?

ময়না আঁৎকে উঠলো যেন। বৌদিদি জানে তাহলে—জানে! নাহলে এমন করে খাবার কথা শুধুচ্ছে কেন? লজ্জায় ও জড়সড় হয়ে গুটিয়ে বসল; উত্তর দিতে বাধছে, কিন্তু উত্তর দিতেই হবে, বলল—যা তুমি রাঁধবে বৌদি—তুমার হাতের রান্না বড্ড মিষ্টি লাগে।

কতদিন খাই নাই······আসতেই পাই না। সুকালে যাই রাত দুক্ষুরে ফিরি···আসি কখন!

—তাই খাবি—বোস। তুর দাদাব সেই বইটো পড়া শেষ হয় নাই নাকি?

—না, পড়া শ্যাষ হয় নাই। আমিও পডলাম একপাতা, বুঝতে লাবছিলোম বৌদি······ভারি শক্ত লিখা···।

দিদি এসে পৌঁছাল; আঁচলে সের তিনেক চাল—এই ছটাকার, বুঝলে, খাও কি খাবে। বৌ কোনো জবাব দিল না—ময়নাই বলল, —যা বাবা দর উঠছে দিন দিন—ক'টাকা মণ লিল দিদি?

—তিনকুড়ি টাকা—তাই কি কিনতে মিলে? আমি ধন্যি, তাই গোবিন্দের ঘর থেকে কিনলোম। কেউ বিচতেই চায না।

—হুঁ—ময়না সর্ব্বাঙ্গ ভাল করে ঢাকতে চাইছে, কারণ দিদি ওর দিকে তাকাচ্ছে! লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে ময়না। দিদি বলল—পালং শাক কুথা পেলি লো ই সুময়? হাটে?

—হুঁ, ঐ উখেনের হাটে! কারখানার মাঝেই হাট বসে যে, সব রকম জিনিস বিচতে আসে!

দিদি বঁটি নিয়ে কুটতে আরম্ভ করলো মূলো বেগুন পালংশাক!··· —কি খাবি বল দেখি? সেই এক প্রশ্ন! ময়না আবার সেই একই উত্তর দিল—বৌদি যা রাঁধে, তাই ভাল হয়। তাই খাবো!

—রাজু গেল কুথাকে? রূপসা? তুর বিয়ের লেগে বুঝি? বিয়েটা এইমাসেই দিতে পাল্লে ভাল হয। ক'মাস হোল লো? দিদি প্রশ্ন করলো।

জানে—এরাও সব জানে তাহলে। লজ্জার ধাক্কাটা ময়নাকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে। সীতার মতন ও যদি পাতালে প্রবেশ করতে পারতো! না, মাতা বসুমতী আজকাল আর মানুষের দুঃখ বোঝে না।

—হুঁ—ময়না একটা নিশ্বাস ছাড়লো—আমি কী যে করবো দিদি! অকূলপাথারে পড়েছি আমি···আমার বাঁচবারও যো নাই, মরবারও উপায় নাই। আশীর্ব্বাদ কর দিদি···আমি মরি—আমি যেন মরে যাই···।

—ওমা, ষাট্ ষাট্, মরবি কিসের লেগে ময়না? কত কষ্টের মানুষ করা বোন তুই রাজুর। কি দুঃখে যে তুখে মানুষ করেছে রাজু·· তা আমরা জানি! মরবি কিসের! এই অকালের বাজারে কত লুক কত কি করছে! বেঁচে থাক—কি এমন অপরাধ করেছিস যে মরবি? ······দিদি বারম্বার সান্ত্বনা দিয়ে বলছে কথাগুলি কিন্তু ময়না ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। ও আর সামলাতে পারছে না। ওর পেটের ভিতর কে যেন আঁচড় কাটছে! যে সন্তান-সম্ভাবনা পরম আনন্দের দ্যোতক হতে পারতো, অবস্থার বিপাকে সেইটাই ময়নাকে অকুলপাথারে ভাসিয়ে দিয়েছে। বৌ বলল—কাঁদিস না ময়না—চুপ কর! দাদাকে তো খইয়ে বাঁচাতে পেরেছিস তুর!

—হুঁ, সেই কথাই কথা। অত কষ্ট করে বড় করেছে। তুই না এমন করলে রাজু না খেয়ে শুকুতো—দিদি বলল আবার।

—কিন্তুক আমি ইবারে কুথাকে যাব দিদি! কে আর আমাকে বিয়ে করতে আসছে! যম যদি আসে!

হু-হু করে চোখের জল বয়ে গেল ময়নার গণ্ড বেয়ে। সমস্ত দেহটা ওর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল কান্নার আবেগে। ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না দিদি আর বৌ। তবু দিদি বলল —কি আর করবি! অত কাঁদিস না, পেট বেদনা করবে আবার! কত লোকের কত কি হয়। যা হয় হোক—ভয় খাস না কিছু!

—দাদা হয়তো জানে না আখুনো···কান্নার মধ্যেই ময়না বলল কথাটা···বলতে আমি যে পারছি না দিদি!

—জানে না? তা হবে! উ যেরকম উদোমাদা মানুষ, না-জানবারই কথা—না লো, জেনেছে হয়তো!

—কে জানে! যদি জেনেছে তো কাল। কাল আমি টুকচেক বেসামাল হয়ে এসেছিলুম···দিদি, কি আমি করবো গো! আমি কুথাকে যাব, আমাকে কলকাতা পাঠায়ে দাও দিদি।

ময়না আবার আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো! ওর সর্ব্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। নিরুপায় নারীর সর্ব্বশেষ আশ্রয়-সন্ধানের আবেদন।

বৌ বলল—বেশ, তাই যাবি, কাঁদিস না ময়না।

—যাবি—তাই যাবি—দিদিও বলল—কিন্তুক যাবি কি করে? বর্দ্ধমানে লাইন ভেঙ্গেছে। যাবার ট্রেণ নাই।

চোখদুটো মুছে ময়না উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো—যাবার ট্রেণ নাই? কেনে! ট্রেণ কি হোল?

—লাইন ভেঙেছে কুথা। আখুন আবার ঐ সেই কাটোয়া দিয়ে ঘুরে ঘুরে কলকাতা যেতে হচ্ছে।

—তাই যাব—আমি ঘুরে ঘুরেই যাব···দিদি···দাদাঠাকুরকে লিখে দাও, আমার লেগে যেন কিছু ব্যবস্থা করে রাখে। আর না হলে আমি মা গঙ্গায় ডুবে মরবো···আমি···

—থাম্···থাম্! ডুবে মরবি কিসের লেগে! ইমন কত হয় সংসারে। হচ্ছেই তো আকছার। ইচ্ছে করে তো কিছু পাপ করিস নাই ময়না—তুর কপালের লিখন···মরবি কেনে!

—আমি জানতুম না দিদি—কিছু আমি বুঝতে লেরেছিলোম! আমি দাদার কুলে মানুষ; উসব আমি কিছুই জানতুম না···ইমন জান্‌লে আমি যেতুমই না উখেনে। হোল কি, জান দিদি? খুব ভাল ভাল কথা বলে' ভাল ভাল খাবার, চাল ডাল দিয়ে দিন চার পাঁচ এটো-সেটো কাজ করালো, তা বই একদিন···দিদি···আমি তখনো

বুঝতে পেরেছিলোম না···বিশ্বেস কর তুমি দিদি···বিশ্বেস কচ্ছো না তুমি বৌদি? ' তুমরা ব্রাহ্মণ, দেবতা, তুমাদের পা ছুঁয়ে বলতে পারি আমি···

দিদি আর বৌ বিশ্বাস করলে ময়নার সন্তপ্ত অন্তর খানিকটা শান্ত হয় যেন। নিয়তির নিষ্ঠুর পাষাণ-ভার যেন কিছুটা কম পড়ে ওর বুকের উপর থেকে। ও যে নিষ্পাপ, ওর জ্ঞানকৃত কোন পাপ নাই, সেইটাই ও এই দরদীদের কাছে জানাতে চাইছে। ওর বেদনার্ত্ত হৃদয় এদের কাছে মুক্ত করে, এদের সহানুভূতির শীতল হাওয়ায় জুড়ুতে চাইছে। দিদি বলল—বিশ্বেস না করবো কেনে ময়না? তু ছেলেমানুষ। উসবের তু বুঝবি কি! উরা তো এমনিই করে! ভুলুয়ে-ভালিয়ে একবার নিযে যেতে পারলে হয়—তা বই করে সর্ব্বনাশ—খুব বিশ্বেস করছি! ···কাঁদিস না ময়না, কাঁদিস না! রাজু আসুক, আমি বলছি, তুখে কলকাতায় দিয়ে আসুক।

—হুঁ, সিখানে খালাস হয়ে আবার চলে আসবি তুর দাদাঠাকুর রইছে·· ওখেনে; ডর কি!—বৌ বলল।

তরকারী কোটা হয়ে গেছে। দিদি উঠে বলল—গল্প কর বৌএর সঙ্গে, আমি ডুব দিয়ে আসি।—গামছা নিয়ে দিদি চলে গেল! চোখ দুটো মুছে ময়না উঠে বসল ভাল হয়ে। লজ্জার নিদারুণ ধাক্কাটা এতক্ষণে সামলে নিয়েছে ও। এরা জানে সবাই, গাঁয়ের সবাই জেনেছে তাহলে। জানুক—জানবেই তো! কিন্তু ময়না এদের কাছে তার নিরপরাধত্বের কথাটা বলতে পেরেছে। দরকার হলে এরা রাজুকে সেকথা বলবে। রাজু যেন ময়নাকে ভুল না বোঝে—আর যার যা খুসী বুঝুক। ময়না বলল—আফিং খেয়ে মরতে মন যায় বৌদি; মনে হয়—অজয়ের বানে ডুবে মরবো···মরতে লারছি শুধু দাদার জন্যে! মরলে দাদা একদিনও বাঁচবে না। দাদা যে আমার বাবার চেয়েও বড় বৌদি—উঃ··· !

আবার কেঁদে উঠলো ময়না। নাঃ, ওকে চুপ করানো অসম্ভব এখন। বৌ বলল তবু—দাদার জন্যেই তো গেইছিলি ময়না। দাদার লেগেই তুর সংসার। তুর দাদা এমন অবুঝ লয়—বুঝবে।

—কিছু আমাকে বলবে না দাদা—কিছুই বলবে না বৌদি। দাদা কখনো আমাকে বকে নাই···কখনো না।

—বকবে কিসের লেগে! তু তো আর ইচ্ছে করে কিছু করিস নাই—খুন্তি দিযে বৌ তরকারীটা নাডতে লাগল।

ধীরে ধীরে ময়নার কান্নার আবেগ শান্ত হয়ে আসছে। কাছিয়ে এসে চুপে চুপে বললো,—বৌদি, সাত মাস হোলো আমার। হারামজাদা আব আমাকে বাখতে চাইছে না। দাদাঠাকুরকে একটা চিঠিতে তুমি সব লিখে দাও বৌদি··আমার লেগে যেন ব্যবস্থা কবে রাখে, আর না হলে যেন বিষ কিনে রাখে খানিকটা!

—চুপ কর ময়না! বিষ খাবি কিসের লেগে! বেঁচে থাক···উপায় একটো হবেই ··।

—মরে গেলেই বাঁচতোম বৌদি! আহা, দাদা আমাকে কেনে এত কষ্ট করে মানুষ কল্লো বৌদি—ছুটোবেলাই যদি মরে যেতুম তো দাদার বুকে এমন শেল বাজতো না ··বৌদি, আমি কুথাকে যাব, কি করবো বৌদি?

কি করবে কিছুই কেউ বলতে পারে না আজ। প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়ম—না, প্রকৃতির স্নেহের বিধানকে আজ মানুষ নিজের নীতি-বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ডখণ্ড করছে। এ নিয়ম মানুষের গড়া যার জন্য ময়না আজ নিরাশ্রয়া! কিন্তু এ নিয়ম, এই শৃঙ্খলায় মানুষের প্রয়োজন আছে, তার সমাজ রক্ষার জন্য, তার বংশধারাকে বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, তার গৃহজীবনের পবিত্র শান্তিকে অব্যাহত রাখার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন এই নীতির। কিন্তু এই নীতিই আজ ময়নার জীবনকে বিষাক্ত করেছে। হতভাগী ময়না! ওর কান্না থামানো দুঃসাধ্য প্রায়।

এর পূর্ব্বে ও একদিনও এমন করে কাঁদতে পায়নি। কার কাছে কাঁদবে! কেউ ওর প্রতি সহানুভূতি জানাবে বলে মনে করেনি ও। কান্নাটা যেন বুকের ভেতর পাথরের মত জমাট হয়ে ছিল—দিদি আর বৌএর স্নেহেব উত্তাপে গলে জল হয়ে ঝরছে। ময়না ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ওকে ভোলাবার জন্য বৌটা অন্য কথা আবম্ভ কবলো—বলল,—নদীতে বান কতটো লো?

—এনেকটো। কাল জল হইছে, আজ এক গলা বান হতে পারে।

—বেশি বান হলে তুবা পুলে পাব হোস তো? পয়সা দিতে হয়?

—না, আমাদের কাছে পয়সা লেয় না। বান তো ই বছব হয়ই নাই আখুনো। এইবারে হবে।

তরকারীটা নামিয়ে বৌ বলল—টক্ খেতে মন যায়, না লো ময়না?

—কিছু না, বৌদি। কিছু খেতে মন সবে না—মনে হয় বিষ খাই। মরে যাক্ ঐ হারামজাদা ছেলে, প্যাটেব ভিতব মবে যাক্!

—ষাট্ ষাট্—উ কথা বলতে নাই ময়না। ছেলেব দোষ কি, বল দেখি। একটি ছেলের লেগে কত লুক মাথামুড খুঁড়ছে! আচ্ছা ময়না, লুকটো কি জাত? বামুন-কায়েত নাকি?

—কে জানে গা! উদের আবাব জাত আছে! গরু খায়, শূয়োব খায়—ওদের আবার জাত বৌদি—হুঁ! জাত থাকলে কি আব এমন করতো? তবে আমিও ছেড়ে কথা কইবো না বৌদি—একটি শ' আদায় করে লিব—না যদি দেয় তো যাবো বড় সাযেবের কাছে। দেখে লিব, উ হারামজাদা কত বজ্জাৎ··

অনেকক্ষণ বৌ আর কোন কথা বলল না। ময়নার কথাই ভাবছে বৌটা। কী ভয়ঙ্কর অবস্থা-বিপাকে পড়েছে ময়না! ওকে রক্ষা করার কোনো উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না বৌ···তবু যদি ময়না কিছু টাকা আদায়

করে নিতে পারে তো ভাল হয়। তার ভবিষ্যতের কিছু সম্বল হয়। কিন্তু টাকা কি আর দেবে সে?

ময়নার ক্লান্তি লাগছে। আঁচলটা পেতে ঐখানে শুলো। খানিকটা ঘুমুলো, তার পর উঠে খেয়ে আবার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলো ঐখানেই। বেলা শেষ হয়ে আসছে এখন—ময়না উঠলো। ঘর যেতে ওর মন সরছে না। কিন্তু না গেলেও নয়।

দাদা এবার ফিরে আসবে—ময়না আস্তে আস্তে ঘরমুখে ফিরলো। এসে দেখলো, রাজু ফেরেনি তখনো।

* * *

রূপশায় রাজু অপমানিত হয়েছে। মকর ডোমের বাবা আজ ওর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলল না—ববং ছোট মেয়েটাকে উদ্দেশ করে রাজুকে শুনিয়ে বলল—

—তুব দাদা আশ্বিন মাসে ফিবলেই, বুঝলি—আগুতে তুর বিয়েটা দিযে লিব মা কিক। যা দিন কাল পড়েছে, বৌ-বিটি-বোনেব ধম্ম বিচে খেতে লেগেছে সব শালারা ··।—বাজুকে দেখেই বলল কথাগুলো, অথচ এমন ভাবে বললো যেন বাজুকে সে দেখে নাই। রাজু দু'আখর লেখাপড়া শিখেছে—এই সব "ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো" কথার মানে বুঝতে ওর দেবী লাগে না—তবুও রাজু এগিয়ে এসে প্রণাম কবে বলল—কেমন আছেন বাবা? ঘবেব সবাই ভাল আছে তো?

—হুঁ—আছি! তা, ই অবেলায় কি মনে কবে?—মকরের বাবা প্রশ্নটা করলো এমনি, কারণ, অ-বেলা তখনো হয় নি, ভাত বেলাও হয় নি। বাজু একটু থতমত খেয়ে বলল—যাব সারসা—পথে পড়লো, তাই ভাবলোম, খববটা লিয়ে যাই···।

—অ···তা বেশ···ওরে কিরু, আমি চল্লুম বাগমারীর ক্যাতটো দেখতে···বুঝলি?

রাজুর সঙ্গে আর কথা না কয়েই ও পথে নামলো। রাজু বুঝলো—এখানের সঙ্গে সম্বন্ধ তার চুকেছে। আচ্ছা! আকাশের পানে তাকিয়ে নিশ্বাসটা চেপে চেপে ছাড়লো রাজু। কিরণ বেরিয়ে এল ঘর থেকে; চোদ্দ-পনর বছরের মেয়ে—বলল,

—তুমাদের ইসব কি কাজ গো! বুনটোকে বিচে খেলে খ্যাযে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ···মাগো মা!

এইটুকু মেয়ের জ্যাঠামী বরদাস্ত করা যায় না, কিন্তু রাজু জানে—ওর মুখের এই কথাটা এই বাড়ীতে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে এবং ও তারই প্রতিধ্বনি করছে মাত্র—কথাটা ওর নিজের নয়। ওর সঙ্গে বিতণ্ডায় কোনো লাভ নাই। বড় আশা করে রাজু আজ এখানে এসেছিল—ভেবেছিল, ওদের ছোট-লোকের ঘরে এসব কলংক খুববেশী ক্ষতি করতে পারবে না—মকরের বাবা রাজিই হবে ময়নাকে নিতে। এবং সেই আশাতেই বোনের ভবিষ্যৎ শ্বশুরকে রাজু 'বাবা' বলে সম্বোধন করেছিল আজ; নাঃ, এদের কাছে কোনো আশা নাই। রাজু কিরণের কথার কোনো জবাব না দিয়ে ফিরলো—পথে নামলো। যাবে কোথায়? সারসাই যাবে নাকি? গেলে মন্দ হয় না—ধেনো মদের দোকান আছে ওখানে—খানিকটা গিলে আসতে পারে। ট্যাঁকের পয়সাগুলো একবার বাজিয়ে নিল রাজু—আছে; অনেক-কটা পয়সা আছে! রাজু চলতে লাগল হনহন করে। রূপশা গাঁয়ের মাঝ দিয়ে পথ—দু'পাশের ঘরবাড়ী প্রায় জনশূন্য; লোক নাই বললেই হয়। কদাচিৎ কেউ বেরুচ্ছে—সব শীর্ণ, কঙ্কাল। এই গাঁয়ে অরুণ লায়েকের সঙ্গে চেনা আছে রাজুর। যাবে নাকি একবার? রাজু ঢুকে পড়ল অরুণের বাড়ীতে। রোগা, হাড়-জিরজিরে একটা বৌ বছর দুই-এর একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে আছে ঘরে। বাচ্চাটা মরেই গেছে হয়তো—বৌটা কিন্তু কাঁদছে না—চুপচাপ বসে আছে; রাজুকে দেখে মাথায় কাপড় টানতে গেল—টানবে কোত্থেকে। কাপড়

নাই—কোমরটুকু ঢাকা আছে মাত্র একটা গামছায়। রাজু বলল—অরুণ বাবু কৈ ঠাকরোণ? ঘরে নাই?

—জ্বর—মেজেতে শুয়ে আছে।

—তুমার কোলে ছেলেটির জ্বর নাকি?

—নাই—আখুনি গেল—চলে গেল। এক ঢোক দুধ পেলে না; ওরে আমার মাণিকরে···!

বৌটা অকস্মাৎ কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো। এতক্ষণ ও একেবারে কাঁদেনি কেন? কে জানে!

—চেঁচিও না—খবরদার বলছি, চেঁচিও না···অরুণবাবু ঘরের ভেতর থেকে বলল—মরে গেল তো করবো কি আর! কারো হাত নাই; কেউ মেরেও দেয় নাই ইচ্ছে করে···অরুণ বলছেই। বৌটা চীৎকার থামালো, কিন্তু ফুঁপিযে কাঁদতে লাগল। রাজু বুঝলো, না-খেতে পেয়ে এদের এই দশা। দেশশুদ্ধ লোকেরই এই দশা। এতে কারুর হাত নেই,—এতে, এই মৃত্যুর জন্য, এই মহামন্বন্তরেব জন্য কারো কোনো দায়িত্ব নাই। এ বিধাতার খেলা—ইচ্ছে? হ্যাঁ, তাঁব ইচ্ছেই!

বৌটা তুলসীতলায় নামালো ছেলেটাকে। উঃ, কি বিশ্রী হয়ে গেছে ছেলেটা! গাল দু'টো গর্ত্ত হয়ে গেছে, চোখ দু'টো পাথরের মত—খোলা দৃষ্টি—কিন্তু ও মৃত্যুতে মুক্তি পেল। রাজু নিশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, অরুণ লায়েক টলতে টলতে উঠে এসে বলল—রেজো যে রে!

—হুঁ—রাজু ফিরে দাঁড়ালো। অরুণ বলল—তুর তো শুনছি আখুন রাজার হাল—আনা দুই পয়সা দিতে পারিস?

—পয়সা রাজু অনায়াসেই দিতে পাবে। দেবাব কথাও ভাবছিল সে, কিন্তু অরুণ লায়েকের মুখের ঐ "রাজার হাল" কথাটার মধ্যে ওর বোনের চরিত্রের যে ইঙ্গিত রয়েছে, তাই শুনে রাজুর মেজাজ চড়ে গেল।

বলল—দিতোম লায়েক, দিবার লেগেই এসেছিলাম, কিন্তুক আমার রাজার হাল কিসের হোল ?

—রাগ করিস না রাজু—অরুণ ভুল বুঝতে পারলো নিজের, সান্ত্বনয়ে বলল—আজ চার দিন খালি জল খেয়ে আছি, বুঝলি ! কাকে যে কি বলে ফেলি···দে, যদি থাকে ।

একটা দু' আনি ছুঁড়ে দিয়ে রাজু বলল—লাও, দিলোম, তবে মনে রেখো লায়েক—ইটি ঐ রাজার হালের থেকেই রুজগার করা পয়সা, চারদিন বাদে তুমাকে এক দানা চাল দিল। বুঝলে লায়েক—আমার বুনের রুজগারে এনেক লুক খায় তুমার মতন··· রাজু চলে আসছে। লায়েকের কদর্য্য ইঙ্গিতটার জবাব দিতে পেরেছে রাজু, মুখের মত জবাব ! অরুণ লায়েক লোলুপ হাতে কুড়িয়ে নিল দু' আনিটা। রাজুর পিছনেই বেরুলো কিছু কিনে খাবার জন্য হয়তো । রাজু খানিকটা এসে পিছনে ফিরে তাকিয়ে বলল, —ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে এস গা !

—সামর্থ্য নাই ভাই রাজু ! থাকুক ঐখানেই। তু চল্লি কুথাকে ?

—চল্লোম এই দিকেই। বৌটার চেহারা ভালো থাকতে থাকতে ছেড়ে দাও নাই কেনে ! ধর্ম্ম বিচে বেশ খইতে পাত্তো তুমাকে··· ! রাজু হাসলো মুচকে। রাগটা এখনো জ্বলছে ওর গায়ে, ওর মনে।

—রেজো !—অরুণ ধমক দিল যেন। হেসে উঠলো রাজু,— —থামো লায়েক, ঐ পথেই রুজগার করে আমার রাজার হাল— বুঝলে ! তুমারও হতে পাত্তো ! বৌটোও সুন্দরই ছিল তুমার !

রাজু বিদ্যুৎ বেগে চলতে লাগলো। সে সইবে না—সইবে না আর কারো মুখের কোনো কদর্য্য কথা ; নির্ম্মমভাবে আঘাত করবে ও তাদের, যারা ওর বোন সম্বন্ধে কথা কইবে। কারুর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব থাকবে না আর—কারুকেই রাজু আর খাতির

করবে না—ছেড়ে কথা কইবে না। ওর উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে গর্জ্জন করছে যেন বিষাক্ত কালসাপ। পথের ধারে একটা লোক মরে পড়ে আছে—পাঁজরার খানিকটা হয়ত শেয়ালে খেয়ে গেছে। লোকটার বয়স কম মনে হয়। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে—রাজু দাঁড়িয়ে দেখল একটুক্ষণ—মরে গেছে—ও মুক্তি পেয়েছে! পৃথিবীর কোনো শালা কেউ আর কিছু করতে পারবে না ওর। মানুষ তো নয়ই—কুকুর শেয়ালও না—দুর্ভিক্ষ-মহামারী-রোগ-শোক, কারু বাবার সাধ্যি নেই—ওর কিছু ক্ষতি আর করে! বাঃ—এমন মুক্তি আর হয় না—তারণ ঠাকুর গায় সেই রবি ঠাকুরের গান :—

"মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"—শ্যাম সমান—বাঃ বাঃ বাঃ!

শ্যাম সমান! এরা সব রাধা, সবাই এরা গোপীজন—সব মরণের সঙ্গে মিললো গিয়ে। কত দীর্ঘ দিনের বিরহ ওদের মিলনের আলোয মধুর হয়ে উঠলো আজ—আহা, রাজু যদি দেখতে পেতো—যদি জানতে পারতো, ওরা কী আনন্দে রয়েছে এখন!

জানতে পারবে—রাজুও মরবে, খুব বেশী দেরী নাই আর! মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারে না। রাজুও পারবে না। তখন ওপারে গিয়ে রাজুও দেখবে ওরা কেমন মুক্তির আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুকে আর ভয় করে না রাজু—ভয় করবে না।

রূপশার পরে খানিকটা ডাঙা, তারপর শাল নদী, তার ওপারেই সারসা—মদের দোকানটা নদীর ঐ কিনারাতেই। ডাঙায় চলেছে রাজু। চোরকাঁটাগুলো ওর ধুতিতে ফুটছে—কাপড়টা সামলে নিল। নদীর বালিতে নামলো—দেখলো—চকচকে বালিতে এখানে ওখানে অসংখ্য মড়া পড়ে···শুকুচ্ছে সব—সব সেই মিশরের মমীর মত শুকিয়ে তৈরী হচ্ছে আগামী যুগের ঐতিহাসিকের গবেষণার খোরাক জোগাবার জন্য। সে-যুগের গবেষকরা ওদের হাড়গোড়গুলো পরীক্ষা করবে—তীক্ষ্ণ অস্ত্র

দিয়ে—সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মন দিয়ে, মনন দিয়ে, মানসিকতা দিয়ে—মজা করে পরীক্ষা করবে আর প্রবন্ধ লিখে নাম করবে। আজ থেকেই তাদের জয়ধ্বনি দেওয়া যেতে পারে। তারা আসবে—আসবেই—তাই জয়ধ্বনি দিয়ে আজ থেকেই তাদের আগমনীও গাওয়া যেতে পারে। তারা যখন আসবে, তখন এবা, এই মৃতের দল হয়তো আত্মিক অঙ্গ নিয়ে এসে দাঁড়াবে তাদের পিছনে—তাদের কর্ম্মে শক্তি সঞ্চার করবে—করবে—তাদেরকে স্নেহাশীর্ব্বাদে আপ্লুত করবে—কববে কি? কে জানে। তবে এরা মরলো ওদের গবেষণার খোরাক যোগাতে—ওদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে—ওদেব উপাধি-সম্মান বাড়াতে—এতে সন্দেহমাত্র নাই!

শাল নদীর জলস্রোত একটু বেড়েছে গত রাত্রের বৃষ্টির জন্য। সামান্য বৃষ্টি হলেই এর স্রোত বাড়ে—আজ হাঁটুর উপর উঠেছে স্রোতটা। রাজু স্রোতে নামলো। ঐ সামান্য স্রোতেই একটা শিশুদেহ ভেসে যাচ্ছে—রাজুর পায়ে এসে লাগলো সেটা। ছেঁড়া কাঁথা সমেত মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে—আজই মরেছে মেয়েটা—এখনো তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ সুন্দর—জলে ধুয়ে ঝকঝক্ করছে, যেন মেজেঘষে সোনার পুতুলকে সযত্নে ভাসিয়ে দিয়েছে—মাতা-ভাগীরথীকে উপহার পাঠাচ্ছে যেন কেউ তার বুক-ছেড়া ধন! হ্যাঁ—ভেসে ভেসে মেয়েটা অজয়ে গিয়ে পড়বে—তারপর অজয়েব স্রোত ধরে ভাগীরথীতেই পড়বে গিয়ে—মা-ভাগীরথী হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে নেবেন। ও মুক্তি পেয়েছে—মা'র কোলে ফিরছে এবার।

রাজু মৃতদেহটা ঠেলে চিৎ করে দিল—সুন্দর চেহারা—যেন চাঁপাফুলের মালা একটি। না-খেয়ে শুকিয়ে মরেছে, নাকি বেশী খেয়ে ভেদবমিতে মরেছে, ঠিক বোঝা যায় না—কিন্তু দেখতে চমৎকার—যেন ঘুমুচ্ছে।

জলের কোমল শয়নে ঘুমুতে ঘুমুতে যাত্রা করেছে মার কোলে।—যা—যা—নিশ্চিন্তে চলে যা মাণিক!

রাজু এপারে এসে উঠলো। ধেনোমদের দোকানদার একটা সপে শুয়ে গান ভাঁজছিল—কেউ খদ্দের নেই—মদ খাবার সময় এখনো হয় নি—দুপুর বেলা। একটা মাত্র মাতাল মাটির একটা ভাঁড়ে মদ নিয়ে বসে আছে একটা বাঁশঝাড়ের ছায়ায়। হাতে দুটো ফুলুড়ি-বেগুনী। রাজু দেখেই চিনলো ন'-পাড়ার কিত্তিবাস গরাই। লোকটা ভয়ঙ্কর মাতাল, আর দস্যু। কতবার যে চুরি করে জেল খেটেছে তার হিসাব নাই। রাজুকে দেখেই বলল সে—আসো রাজু!

—হুঁ! যাই! রাজু এগিয়ে গেল ঐ বাঁশঝাড়টার দিকেই। কিত্তিবাস হাতের একটা বেগুনী এগিয়ে দিতে দিতে বলল—হোক—ইচ্ছে কর একটুস! বস—বস। রাজু বুঝলো, কিত্তিবাস রাজুর কেনা মদে ভাগ বসাতে চায়, তাই আগাম এই বেগুনীটা ঘুষ দিয়ে রাখছে। কোন কথা না বলে বসল রাজু—এই বেগুনীটাও নিল। তারপর দোকানীকে বলল—দাও গো এক পাণ্ট দাও দেখিনি!···উঠো। দোকানী খদ্দের পেয়েছে—অতএব গানটা আরো জোরে গাইতে গাইতে উঠে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধেনোমদ আর ফুলুরী মুড়ী-ছোলাভাজা নিয়ে এল। রাজু কিত্তিবাসের মতন পাঁড় মাতালের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে মদ খাচ্ছে আর গান করছে। অশ্লীল, অভদ্র, ইতর লোকের মতন গান করছে রাজু। ওর রক্তে যে পূর্ব্বপুরুষার্জিত নোংরামী সুপ্ত ছিল—সেটার পূর্ণ প্রকাশ পাচ্ছে এখন। এই কিছুক্ষণ আগে রাজু কত বড় বড় কথা ভেবেছে—কত উচ্চশ্রেণীর চিন্তা করেছে, এখন আর সে সব কিছুই মনে পড়ছে না। এ রাজু যেন সে-রাজু নয়। রাজুর যেন এখন কোনো চিন্তা নাই। কোনো দুঃখ নাই, কিছু করবার নাই! পরমানন্দে মদের ভাঁড়টা নিয়ে গান ধরলো···

বর্ষাকালে ফর্সা দেখে দাঁড়কে উঠেছে

ও ভাই দাঁড়কে উঠেছে।

সকাল বেলায় নদীর মানায় গুলাপ ফুটেছে—

রে ভাই গুলাপ ফুটেছে !

বাবুদের ঐ গুলাপ ছুঁড়ি···বয়স হোল বছর কুড়ি—

তার পিছুতে গুটাকতক ছোঁড়ে জুটেছে—

ও ভাই গুলাপ ফুটেছে।

মাথা নাই মুণ্ডু নাই, গান চলেছে বাঁশঝাড়ের ছাওয়ায় বসে। রাজুর সাংস্কৃতিক সমস্ত চেতনা মগ্নতার অন্ধকারে। চৈতন্যের মধ্যে পূর্ণ প্রকট হয়ে উঠেছে তার জাতিগত, আর বংশগত কদর্যতা! ট্যাকের খুচরো পয়সা শেষ হবার পর ফতুয়ার আভ্যন্তরীণ পকেট থেকে দু'টো এক' টাকার নোট বেরুলো—শেষ হ'য়ে গেল মদে আর চাটে। মাংসের চাট, কিসের মাংস, জানবার কোনো দরকার বুঝলো না রাজু। নদীতে পড়ে থাকা ঐ মড়াগুলোর মাংসও হতে পারে—এমন সন্দেহ জাগল না ওর। প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি—দোকানী বলল—আর না রে, আর খাস না—যেতে লারবি।

—তু শালার ঘরেই থেকে যাব র্যা···দিবি না থাকতে! তুর তো শালা মা-বোনও নাই, ডর কি আছে! আমি শালা রাজু ডোম··বুঝলি···টাকার ঝুড়ি পাবি—হুঁ!

মাতালদের কাছে এরকম খারাপ কথা শোনা দোকানীর অভ্যাস। কি করবে—খদ্দের, তা ছাড়া মাতাল। দোকানী আর একবার বলল—যা শালা ঘরকে যা—খাস না আর !

—ঘরকে যাব? ঘরে কি আছে বাবা সাঙাৎ? মাগ না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো? আছে এক শালি বুন—তা, সি শালীর আজকাল পাখা হইছে···বুঝলি ভাই কিত্তিবাস—উ শালীকে কেটে খণ্ডখণ্ড করে

দিতোম—কী করবো—বুন। করুকগা যার যা খুসী। আমি বাবা—বুঝলি কিত্তি—কুনো শালার তাঁবে খাটি না—হুঁ! মদ খাব না তো কি ডরাব নাকি র‍্যা শালা?

দোকানী আর কিছু বলল না—কারণ মাতালকে থামানো প্রায় অসাধ্য। কিন্তু কিত্তিবাসই ওকে টেনে তুলে নদীতে নামালো। রাজু টলছে—ভীষণ রকম টলছে! কিত্তিবাস কিন্তু আশ্চর্য্য মাতাল। স্থির ধীর পায়ে সে রাজুকে পার করালো নদী—এপাশেও খানিকটা পথ একসঙ্গে এল—রূপশা গাঁ'টা পার করে দিয়ে লাটকোনার ডাঙায় তুলে দিয়ে বলল—যা, ইবার চলে যা ঘরকে!

—চলে যাব? কুথাকে চলে যাবো! কুন শালার ঘর! কুন শালী বিছানা পেতে রেখেছে···? গান ধরলো রাজু:

শেজ বিছাইয়ে মালাটি গাঁথিয়ে বাঁধিয়ে মাথার কেশ

আমি সারাটি রজনী জাগিয়ে কাটানু, বঁধু গেল কোন দেশ?

কিত্তিবাস আর অপেক্ষা না করে চলে গেল। রাজু টলতে টলতে ফিরছে আর গান করছে। শ্রাবণ ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না—সুন্দর, শুভ্র, সুকোমল। প্রকৃতিস্থ থাকলে রাজু কত কথা ভাবতে পারতো, কত ভাল ভাল গানের কলি বাঁধতে পারতো।

রাজু টলছে—চলছেও—গানও চলছে। শঙ্করের বাড়ীটাই কাছে পড়ে—ঢুকে পড়লো।

—সাঙাৎ—সাঙাতিন্—আছে নাকি হ্যা সাঙাতিন্!

শঙ্কর কোথায় গেছে, ওর বৌ জবা ঘর থেকে সাড়া দিল,—এসো সাঙাৎ—উ ঘরে নাই।

—ঘরে নাই! বেশী হয়েছে মাইরা। বসো তো তুমি সাঙাতিন একবার আমার কাছে—যেমন সেই···'শ্যামের বামে রাইকিশোরী!—সুর করে বললে রাজু—বসো, বসো, ডর কি! রাজু অকস্মাৎ জবার

আঁচলটা টেনে ধরলো। জবা ভয় পেয়ে গেছে। রাজু তো এরকম করে না—এ কি ! এত বেশী মাতাল কোনো দিন হয় না রাজু। জবা ভয়ে ভয়ে বলল,

—উ কি সাঙাৎ—উ কি ! উসব কি বলছো···ছিঃ ছাড়, ছাড। কেউ এসে পড়বেক আখুনি !

—কুন শালা ! কার বাবার সাধ্যি তুমাকে আজ আমার কাছ থেকে লিয়ে যায়··· ?

রাজু মত্ত আবেগে জড়িয়ে ধরলো জবাকে। জবার ভয় শঙ্করকে। শঙ্কর মন্তরের জোরে সব জানতে পারে···আর জানতে পারলেই ভেঁড়া-ছাগল করে দেবে মন্তর পড়ে। তবুও জবা মিনিটখানেক চুপচাপ থেকে গেল। রাজু ওর দেহখানাকে পিষে ফেলবার উপক্রম করছে যেন। জবা বলল—ছাড়ো সাঙাৎ, ছাড়ো—উঃ !

—না—হারামজাদী—কাঁহাকা ! সাঙাৎ ! তুর বাবার সাঙাৎ, তুর চৌদ্দ পুরুষের সাঙাৎ আমি ? লয় ?

জবা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে—রাজু ওকে মেরেই ফেলবে নাকি ! চেঁচিয়ে বলল—ছাড়—মা মনসার দোহাই—শ্যাম রায় কালো রায়ের দোহাই···ছাড়— ।

—ধোত্তেরি শ্যাম রায় ! শ্যাম রায় তুর বাবা হয়···চলে আয়·· আয় ইদিকে·· ! জবাকে টানছে রাজু সজোরে। জবা জানে, শঙ্করের আসতে দেরী আছে—সে গেছে বাগডহরা—ভূত ছাড়াতে। আজ না-ফিরতেও পারে। কাজেই সে দিকে ওর ভয় কিছু নাই, কিন্তু শঙ্করের মন্ত্রকে ওর বড় ভয়। বলল—

—যদি জানতে পারে তো ভেঁড়া করে ছাড়বেক—বুঝলে !

রাজু একটা কদর্য্য অশ্লীল কথা বলে উঠলো শঙ্করের উদ্দেশ্যে। জবাও যেন কেমন হ'য়ে গেছে। আত্মসমর্পণের ইচ্ছাটা ওর ক্রমশঃ জোরালো

হয়ে আসছে। ভাবছে—মন্ত্রের জোরে সত্যি কি আর ভেঁডা করা যায়! দূর! ওসব মিছে কথা।

বহুদিন রাজু নারী-সঙ্গ বর্জিত—। বহু বহু দিন। ওর উদ্দামতা এতদিন যেন সুপ্ত ছিল, আজ হঠাৎ বল্গাছেঁড়া ঘোড়ার মতই মনটা মুক্ত হয়ে গেছে। রাজুর সমস্ত শিক্ষাকে ডুবিয়ে দিয়ে বানভাসী হয়ে যাচ্ছে কামনার গৈরিক স্রোতোধারা। ওর আত্মরক্ষা করবার কোনো উপায় নাই আজ। জবা যেতে যেতে বলল—

—তুমার হোল কি আজ সাঙাৎ! তারণ ঠাকুরের সাকরেদ্ তুমি· !

তারণ ঠাকুর—হ্যাঁ, তার সাকরেদ রাজু! রাজু সেই ঋষিবংশধরের শিক্ষার অসম্মান করছে। তারণ ঠাকুরের "কদম ফুলের"-এর কবিতা মনে পড়ল—

"মরণের বীথিকায় জীবনের জয়গান—জীবনের যাতনায়
মৃত্যুর মাধুরী

জীবনের জয়গানই বাজাতে চাইছে তো রাজু হ্যাঁ, জীবনের জয়গানই, কিন্তু জীবনের যাতনায় যে মৃত্যুর মাধুরী জাগে। দেহের কঙ্কালে বন্দী জীবনের যাতনা যে মৃত্যুর মাধুরীতেই মুক্তি পায়—জীবনের সাধনার চেয়ে মরণের সাধনা আরো বড় আরো মহান, রাজু ছেড়ে দিল অকস্মাৎ জবার হাত।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাবে নাকি রাজু? জবা কিন্তু অদ্ভুত, আশাহত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে। বলল হেসে—কি হোল সাঙাৎ? হোল কি তুমার আবার?

—না—কিছু না! সাঙাৎ কৈ সাঙাতিন্? গেল কুথাকে?

—বাগডহরী গেইছে। আজ বুধ হয় আর আসতে লারবেক। এনেকটো রাস্তা।

—হু···আচ্ছা! চল্লোম তা'হলে·· রাজু ফিরতে গেল। জবা

ত্বরিতে ওর বুকের কাছে এসে বলল—কেনে সাঙাৎ, কেনে? যাবে কেনে হে?···আমি তো কিছু বলি নাই!

—না···বলবে কি আবার! যেতে হবে। ময়না একলা আছে। রাত হোল—ছাড়···।

—সি কি সাঙাৎ! জবার দুই চোখে কামনার উগ্র ক্ষুধা—নারীর মোহনীয় মায়া···!

নারী—রক্ত আর মাংস দিয়ে সৃষ্ট ঈশ্বরের ইন্দ্রজাল। ওদের জন্যই মানুষ ঘর বেঁধে মায়ার শ্রেষ্ঠ বন্ধন সন্তান-সন্ততির সোনার বীথি রচনা করে;—ওরাই বাধ্য করে মানুষকে ঐ রকম করে ঘর বাঁধতে—জীবনের বন্দিত্ব স্বীকার করে নিতে। জীবন-দেবতার হাতে ওরাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র! ওদেরই আশ্রয়ে জীবন লালিত হয়, পালিত হয়, শৃঙ্খলিত হয়—জীবনের যাতনায় মৃত্যুর মাধুরী ফোটাতে ওরাই দেরী করে দেয়। ওরা সাবিত্রী হয়ে স্বামীকে বাঁচায় সংসারে বন্দী করবার জন্যই—একশ'টা ছেলের বাপ করবার জন্যই। ওরা বেহুলা হয়ে কঙ্কালগুলোকেও বন্দী করে রাখে—নাচে-গানে দেবতাদের খুসী করে লখিন্দরের কঙ্কালকে ওরা জীবনের গণ্ডীতে শৃঙ্খলিত করে। আশ্চর্য্য! যেখানে যত নারীর চরিত্র মনে পড়ছে রাজুর—সবাই এমনি—এই বন্ধনের রজ্জু—হ্যাঁ, সবাই। মুক্তি এরা দিতে চায় না—জবাও দিতে চাইছে না মুক্তি রাজুকে। জবা ওর হাতটা ধরে বলছে—চলো সাঙাৎ ঘরকে চল ভাই···ই সুময় আর যেও না!

—পিশাচী! রাক্ষসী! রাজু হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। মুক্ত!—এই পাপ থেকে মুক্ত হবেই সে—ছুটে বেরিয়ে চলে গেল রাজু গ্রাম পথের মাঝ দিয়ে। শ্রাবণী জ্যোৎস্নায় ওর সাদা ফতুয়াটা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জবা অবাক!

* * *

গোয়াল-ঘর সংলগ্ন ছোট্ট ঘরটীতে বারুণী বন্দিনী। সারাটা দিন ওর

একলা কেটেছে। মাঝে একবার নাটু স্বয়ং এক বালতি জল আর একটা গামছা দিয়ে গিয়েছিল স্নান করবার জন্য, আর একবার নাটুর পুরোনো চাকর শামু এক থালা ভাত দিয়ে গিয়েছিল। ঐ খেয়েই বারুণীর কেটেছে সমস্ত দিনটা। রাগে বারুণী ফুলে ফুলে উঠছে, বার বার ঠোঁট কামড়াচ্ছে আর বলছে,—দেখে নিব আমিও। কিন্তু কি করে নাটুকে শায়েস্তা করতে পারে তার মত একটা ক্ষুদ্র মেয়ে, সেটা ও তখন চিন্তা করেনি। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে বারুণী একটা মতলব ঠিক করে ফেললো। আচ্ছা, সে দেখে নেবে—দেখেই নেবে একবার ভাল করে নাটুকে। সে কলঙ্কিনী, সে তার যৌবন বিক্রী ক'র বেঁচে থাকে- এ-কথা জেনেছে লোকে—আরো ভালো করে জানুক—সে নিজেই জানিয়ে দেবে। সমস্ত দিনের বন্দিত্বের বেদনা ওকে ভীষণ এক সংকল্পে সুদৃঢ় করে দিল। বন্ধনের বেদনা ওর জানা ছিল না। মুক্ত বিহঙ্গিনার মত ও ছোটবেলা থেকে যা-খুসি করে এসেছে, যেখানে ইচ্ছে গেছে, যার সঙ্গে ইচ্ছে মিশেছে। ওকে কেউ কিছু বলেনি বলেই ও ছিল সবল আর স্বচ্ছ। কুটিলতা ও জানতো না। তাই কিষ্টর ঘরে ও যতদিন ছিল, এক মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাসিনী হয়নি। সবাই ওকে সদিন বিশ্বাস করতো, ভালো বাসতো। তাই অভাবের দিনে কিষ্টকেই একলা পেটে খাবার সুযোগ দিয়ে ও বাপের বাড়ী এসেছিল—ভেবেছিলো সুসময় এলেই আবার যাবে কিষ্টর কাছে। কিন্তু সুসময়ের বদলে এল দুঃসময়—মড়ক, মন্বন্তর। কিষ্ট ওকে আর এখন খাওয়াতে পারবে না,—তাই গেল না শ্বশুরবাড়ী। তার পর বাপের বাড়ীতেও খাদ্যাভাব ঘটলে ও যায় ঐ নদীপারে খাটতে। যে-আড়কাঠি ওকে আর ময়নাকে নিয়ে গিয়েছিল ভুলিয়ে—তাকে ওরা এখন আর দেখতে পায় না। প্রথম প্রথম ওসব লোককে ঘৃণাই করতো ওরা—হয়তো এখনো ঘৃণাই করে, কিন্তু ওখানে না গেলে খাদ্য জোটে না। বাঁচবার প্রয়োজনের তাগিতেই ওদের যেতে হয়। আরো কত গাঁয়ের কত

মেয়ে যায়—যেতে বাধ্য হয়। এখন যায়—দিন-সময় ভাল হলেই আর যাবে না—এই ছিল ওর মত, আর ওর মা'র ছিল তাই অভিমত। ঐ নিয়ে কোনো হৈচৈ ঘটবে—জানতো না বারুণী। কিন্তু আজ যতখানি হৈচৈ ঘটেছে তা বিপর্য্যযকর। নাটু কাল সারাটা রাত ওকে ধমকেছে—সোহাগ করেছে—আদর করেছে—টাকা, পয়সা, চাল, ডাল দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—কিন্তু নাটুর আর কি এমন পয়সা বা চাল আছে! থাকলেও বারুণী বিশ্বাস করে না নাটুকে। শেষে ঐ কুন্তির দশা হবে তো! বারুণী অত বোকা হবে না।—তা ছাড়া, কাল যা হবার হয়ে গেছে—আজ এখনও বারুণীকে নাটু বন্দী করে রাখলো—আর বারুর মা-বাবা কেউ ছাড়াতে এল না—দেখতে পর্য্যন্ত এল না! বাহা রে! বেশ তো! বাবা আবার কাল গালমন্দও দিয়েছে। বাঃ! বলে সেই—"যার জন্য চুরি করি—সেই বলে চোর—" বারুণীর নিদারুণ অভিমান হচ্ছে মা-বাবার উপর। আবার ভাবছে, নাটু হয়তো তাদের ঢুকতে দেয়নি—সেইটাই সম্ভব।

বন্দিনী বারুণীর চোখ জলে ভরে উঠেছিল কাল রাত্রে—আজ সকালেও। কাকুতি মিনতি করেছিল নাটুর কাছে তাকে মুক্তি দেবার জন্য…এমন কি, আত্মসমর্পণ করে নাটুর কাছে থাকতেও চেয়েছিল, কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী—নাটু তালা দিয়ে বন্দীই করে রাখলো তাকে। আচ্ছা! বারুণী এবার দেখে নেবে কেমন নাটু!

ওর সমস্ত অন্তর নাটুর বিরুদ্ধে, ওর মা-বাপের বিরুদ্ধে, এমন কি গাঁয়ের সকলের বিরুদ্ধে গর্জ্জে উঠতে লাগল। বেশী অভিমান হচ্ছে ময়না আর বাজুর উপর। ময়না একটিবার খোঁজও করলো না। আশ্চর্য্য! প্রতিদিন বারুণী উষার আগেই ময়নাকে জাগিয়ে দেয় গিয়ে। নারদ বোরেগী টহল দিতে বেরুবার আগে উঠে বারুণী যায় ময়নার বাড়ী—ঘুম-কাতুরে ময়না তা' নইলে উঠতে দেরী করে ফেলবে। সেই ময়না, যাকে পাঁচ ছ' মাস বারুণী ছোট বোনের মত দেখে এসেছে, সব রকমে সাহায্য

করে এসেছে, শিখিয়ে এসেছে, কি ভাবে তার আশু বিপদটা থেকে উত্‌রে যেতে পারবে—সেই ময়না একবার খোঁজও করলো না তার! আশ্চর্য! ময়নার উপর রাগ, অভিমান, বিদ্বেষ জ্বলন্ত হ'য়ে উঠলো বারুণীর অন্তরে! ভাবতে লাগল—ময়না যদি নদীর ওপারে যেয়ে ঘোষ সাহেবকে বারুণীর বিপদের সংবাদটা দিত, তা'হলে এতক্ষণ ওখান থেকে জমাদার এসে নাটুকে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেত। ময়না সে কাজটা অনায়াসেই করতে পারতো—করলো না—খোঁজও নিল না!

ওখানে যারা কাজ করতে যায়—তাদেরকে কাজ করতে নিষেধ করা আইন-বিরুদ্ধ। নাটু শুধু নিষেধই করেনি, বন্দী করে রেখেছে বারুণীকে··· আচ্ছা!

বন্দিনা বারুণী জানালার গরাদে মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে আর সামনের পথপানে চাইছে। হুঁকো-কলকে হাতে যদি কেউ যায় এই পথে তো কলকেটা চেয়ে নিয়ে দু'টান টেনে নেবে। কিংবা বিশেষ বন্ধুলোক কেউ যদি যায় তো একটা বিড়িও চাইতে পারে। কাল থেকে ও তামাক খেতে পাযনি। মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়ে রয়েছে—মাথাটা খালি খালি লাগছে। নাটু যদি গোটাকতক বিড়ি আর দেশলাই দিত তো এতটা কষ্ট হ'ত না বারুণীর। হতভাগা মোড়ল একবার ভেবে দেখলো না যে, খুব ছোটবেলা থেকে বারুণীর তামাক খাওয়ার অভ্যাস। বারুণী ভাত না খেয়ে একটা দিন অনায়াসে থাকতে পাবে—কিন্তু তামাক না খেয়ে থাকা ওর পক্ষে বড়ই কষ্টকর।

গট্‌গট্ করে কে যেন যাচ্ছে এই পথে। শ্রাবণী জ্যোৎস্নায় বারুণীর চোখ চিনে ফেললো লোকটাকে···ডাক দিল—রাজুদা···ও রাজুদা··· শোন শোন!

রাজু তখন মাতাল, অপ্রকৃতিস্থ, তারপর জবার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে রাজু! জবা নারী···নারীকে রাজু আর বিশ্বাস করতে পারবে না।

নারী-কণ্ঠের আহ্বান ওর কানে বীভৎস মনে হচ্ছে। ভাবলো, জবাই বুঝি আসছে পিছনে পিছনে। উত্তর না দিয়ে রাজু আরও জোরে ছুটে পালাতে চাইছে। আবার ডাক এল, 'আমাকে কুলুপ দিয়ে রেখেছে! অ'রাজুদা··· দেখে যাও, আমাকে চাবি এঁটে রেখেছে নেটো মোড়ল!'

রাজু শুনতে পেল কথা কয়টা। কে তা'হলে! কাকে রেখেছে নাটু কুলুপ দিয়ে! ও, বারুণীকে! সকালে বারুণীর মা আর কিষ্টর কথাগুলো মনে পড়ে গেল রাজুর। তাহলে বারুণীই ডাকছিল। ও হয়তো নাটুর ঐ গোয়ালঘরে বন্দিনী। রাজু ফিরে এল। বারুণী অভিমানে কেঁদে ফেলেছিল—ভেবেছিল, রাজু আসলো না ইচ্ছা করেই।

—কে। বারুণী?—এইখেনে ভরে রেখেছে তুখে?

—হুঁ—বারু কান্নাভরা গলায় জবাব দিল জানালার ওপার থেকে। রাজু কি করবে ভাবছে—বারুণী বলল আবার—ময়নাকে বলে ঘুষ সাহেবকে খবর দিতে পার না রাজুদা···তাহলে দেখতোম নেটো মোড়ল কেমন মরদ। চুটি আছে রাজুদা।

বিনা বাক্যব্যয়ে রাজু বিড়ি দেশলাই বার করে দিল ফতুয়ার পকেট থেকে। পরমাগ্রহে জানালার ফাঁকে বিড়ি দেশলাই নিয়ে বারুণী ধরিয়ে ফেললো বিড়িটা।

আঃ কি আরাম! অমৃতও এত মিষ্টি লাগে না। বারুণী কয়েকটা টানেই বিড়িটা শেষ করে আনলো—রাজু তখনো দাঁড়িয়ে। বারুণী বলল—আর একটো দাও বিড়ি। রাজুর কাছে গোটাচারেক বিড়ি ছিল তখনো—সব কটাই ওর হাতে দিয়ে বলল—ভাবিস না—আমি দেখছি কদ্দুর কি কত্তে পারি। ময়না আজ যায় নাই ওখেনে।

—কেনে? ইকলা যেতে লারলো—না কি? আচ্ছা ডরুক মেয়ে কিন্তুক ময়না!

বারুণী বেশ সহজ ভাবেই হেসে কথা কইল। কোনকিছু ভাববার

নাই। ও যে বন্দিনী সেটা গ্রাহ্য করবার মত এমন কিছুই ব্যাপাব নয় এখন। মেয়েটা অমনি। যখন যেটা ভাবে, খুব ভীষণভাবেই ভাবে··· আবাব ভাবে না তো একেবারেই ভুলে যায় সে ভাবনা। বাজু বডদাদাব মতই সস্নেহে প্রশ্ন কবল—

—খেয়েছিস কি? খেতেও দেয় নাই নাকি?

—দিইছিল। ভাত, ডাল, বামঝিঙেব চচ্চডি আব আমডাব টক। খেযেছিলাম।

ও চলে যাওযাব পব বাকুণী বিডি চাবটি আব দেশলাইটা পবম যত্নে লুকিয়ে বাখলো ঘবেব একটা ছোট কুলুঙ্গীতে। নাটু এখনো আসে নাই—আসবে নিশ্চযই এতে কোনো সন্দেহ নাই বাকুণীব। বুডো খাসীটাকে আজ ঘব থেকে বাব কবে গোযালেব ওদিকে বাখা হযেছে দুপুব বেলা থেকে। ঐ খাসীটা তবু বাকণীব সঙ্গী ছিল। ওর গাযে হাত বুলিয়ে—ওকে আদব কবে, ওব সিং-এব খাঁজগুলো গুণে গুণে সকালটা একবকম কাটিযেছিল ভালই। তাবপব থেকে একেবাবে বাকণী একা। সাবাটা দিন—শ্রাবণ মাসেব সুদীর্ঘ দিন পাব হয়ে গেল। একটু বৃষ্টি হয নাই যে ধাবাবর্ষণ চেযে দেখবে—কডা বোদে গোটা দিনটা যেন পুডেছে আজ। গাছপাতা সব শুকিয়ে গেছে—কালকাব বৃষ্টিতে যতটুকু যা ভিজেছিল। পিপাসা পেযেছে বাকণীব, কিন্তু জল নাই আব। নাটু এলে একটু জল চাইবে। বাত বোধ হয বেশী হয নি।

বারুণী ঘবেব মেঝেটায বসল। প্রায অর্দ্ধ-উলঙ্গ আছে ও। নাটুব দেওযা কাপাডখানা বড্ড পাতলা ছিল—আব পুবোনো ছিল, পাছাব কাছে ছিঁডে গেছে। ওব নিজেব কাপডখানা কোথায়, কে জানে। খুঁজে পাচ্ছে না বাকুণী। হয়ত বাইবে শুকুতে দেওযা আছে। ক'দিন এমন কবে বন্দী থাকতে হবে, কে জানে!

—বারু! শুনছিস। ও বাকু! জানালাব ওদিকে কে ডাকছে।

বারুণী চিনলো, কিষ্ট ডাকছে; ঐ মুখপোড়ার জন্যই অত কষ্ট। রাগে বারুণীর মুখখানা কুৎসিৎ হ'য়ে উঠলো। বলল—কিবে আঁটকুড়ির ব্যাটা—কি বলছিস! নাটু মুড়লের সঙ্গে বৌ-ভাগ করতে এলি নাকি রে হারামজাদা?···ভাগ···ভাগ ইখান থেকে বারুণী রুখে উঠে দাঁড়াল।

কিষ্ট রাগ না করে বলল—বুঝতে লেরেছিলাম বারু···রাগিস্ না—শুন্।

—শুনতে লারিগা আর! যা, পালা ইখান থেকে। তুর মুখ দেখতে চাই না—বে-আক্কেলে ছুঁড়া কুথাকার!

—শুন্—শুন্ বারু! আমি থানায় গিয়ে খবর দিব ইজেহার দিবার সময় তু বলিস যে, নাটু জুরজবরদস্তি তুখে···

—হুঁ রে আঁটকুড়ো—বলবো তাই। আমার দায় পড়েছে মিছে কথা বলতে! আমি বলবো যে কিষ্টে হারামজাদা একপাই চাল নিয়ে আমাকে বিচে দিয়েছে নাটুর কাছে! দেখিস বলি কি না· ।

—বলবি! বলবি তু এমন মিছে কথা?

—মিছে কথা! মিছে কথা হোল শালভরা? · বিচিস নাই তুই? তুই বিক্কি করিস নাই আমাকে?

—না, বারু না! বিক্কি করবো কিসের লেগে! তুখে নিয়ে ঘর কত্তে চাইছিলোম।

—কে? ওদিক থেকে যেন ডাকলো। আলো হাতে আসছে লোকটা। নাটু নাকি! হ্যাঁ নাটুই! কিষ্ট চাপা-গলায় বলল—আমি আসবো আবার—বুঝলি? পালিয়ে গেল কিষ্ট। নাটুর ভয়ে নিজের বিয়ে-করা-বৌ-এর কাছ থেকে ওকে পালিয়ে যেতে হোল। ওর দুর্ভাগ্য! নাটুকে কিছু বলবার ওর উপায় নাই, কারণ, নাটু ওকে তেরটা টাকা দিয়েছে আর লিখিয়ে নিয়েছে হ্যাণ্ডনোট। সেই হ্যাণ্ডনোটে কি যে লেখা আছে, কিষ্ট জানে না—টাকা ক'টা নিয়ে টিপসই ক'রে দিয়েছে···। সাক্ষী আছে কুমদীশ, হরি, শম্ভু—নাটুরই সব তাঁবেদার যারা। কুমদীশই

বলেছিল চুপি চুপি···'বৌটাকে বিচে দিলি র‍্যা ?' টাকা ধার করলে যে বৌ বেচা হয়—কিষ্ট জানতো না—হ্যাণ্ডনোটের সর্ত্ত "টাকার সুদসমেত চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকার"—কিন্তু কুমদীশ বলছে যে· ·'ঐ টাকার দায়ে তুখে আর বারুর সঙ্গে কথা কইতে দিবে না নাটু ! তুখে গাঁ থেকে তাড়াবে !'

টাকাটা কিন্তু কিষ্টর বড্ড দরকার ছিল। শীতকালে একটা কাবুলীর কাছে কিষ্ট চাদর কিনেছিল একখানা· তখন কি জানতো যে, দেশের এমন দিন হবে ! কিষ্ট তখন ভালই রুজগার করতো। সেই কাবুলী কিষ্টকে ডালকুত্তার মতন লেগেছে এখন। পাঁচ টাকার চাদর—তার দাম তের টাকা লিখে নিয়েছিল—সেই টাকা তেরটি আজ নাটু দিল কাবুলীকে আর কেষ্টকে লিখিয়ে নিল হ্যাণ্ডনোট। কিষ্ট দিত না কাবুলীকে টাকা। দেবার ওর মোটে ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু নাটু বলল- তুই আখুন আমার ঘরে থাকবি—আমার ঘরে কাবুলী এসে তুকে টাকার তাগাদা করবে—এ সব চলবে না কিষ্ট আমার মান থাকবে কেনে ? আমিই দিচ্ছি···সুময়কালে উশুল দিস।· কিষ্ট নিরুপায় হয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছে—টাকা নিয়ে কাবুলী চলে গেলে। তারপর কুমদীশ বলেছে কিষ্টকে যে, ঐ তের টাকায় নাটু কিনে নিল বারুণীকে ! কিষ্ট বিশ্বাস করে নাই প্রথম। নাটুকে জিজ্ঞাসা করবে ভেবে তার কাছে যেতেই নাটু বলল—

—বৌ পুষবি কি দিয়ে রে হারামজাদা· আমার ঘরেই চাল নিয়ে তো ! তার থেকে থাউক আমার ঘরেই···নদীপারে না যেয়ে গাঁয়েই রইল—যা—কাজ করা গা তু।

ব্যাপারটা বুঝতে কিষ্টর দেরী হয় নাই। তারপর গেয়েছিল সে বারুর মা'র কাছে। কিন্তু সে তো গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে—রাজুও বলছে থানায় গিয়ে লাভ বিশেষ হবে না। কিন্তু কিষ্ট সারা দিন ভেবেছে, কি করবে—কেমন করে উদ্ধার করবে বারুণীকে।

পালিয়ে গেল কিষ্ট—বারুণী হাসলো মুচকি হাসি! ব্যঙ্গের হাসি! হতভাগা ছুঁড়া! নাটু এসে পৌছালো—হাতে একটা শালপাতার ঠোঙ্গাতে গোটা কযেক সেঁকা রুটি, একটু গুড আর একটু ডাল, তবকারী—বাঁ হাতে লণ্ঠন আব জলের ঘটি। বারুণীর ঘরের দবজা খুলতেই বারুণী সমাদবে বলল—সারা দিনটো না খাইযে রাখলে মোড়ল—কি অপবাধ কবেছি তুমার?

—সে কি রে—দিনে ভাত দেয় নাই?—নাটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালো, তারপর বলল—কে কথা কইছিল র‍্যা—কিষ্টে এসেছিল নাকি? উ হারামীকে তো তাড়াইয়ে দিয়েছি আমি।

—বেশ করছে মোড়ল! দাও, কি আনলে দাও দেখি। দিনে চাট্টি ভাত খেইছিলেম—তা, উ ক'টি ভাতে হয় নাকি আমার! দাও—কি এনেছ—রুটি? বেশ!—বারুণী ঠোঙ্গা খুলে দেখল।

—একটুস বাইরে যাব মোড়ল—বিশ্বেস না কর তো তুমি সঙ্গেই চল—। বারু বলল একটু পরে।

নাটু জানে—যৌবন এদেব ব্যাঙ্ক নোট—সুবিধে মত ভাঙ্গিয়ে খায়। নাটুকে অগ্রাহ্য করবার বা নাটুর উপব রাগ করবার বিশেষ কোন কারণ নাই বারুণীর। বলল,

—যা—ঐ উঠোনে যেযে হাত-মু ধুযে আয় গা—নাটু ঘরের মধ্যে বস্তাটায় বসল।

—যদি পালায়ে যাই!—বারুণী বলল হাসতে হাসতে। কর অর্দ্ধোন্মুক্ত অঙ্গলাবণ্য সারাদিনের গরমে আর বন্দিত্বের বেদনায় স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে। সেইদিকে তাকিয়ে নাটু বলল—আমি নাকি এতোই বোকা রে বারু! উঠোনের উদিকে সদবে কুলুপ দিয়েছি, দেখেছিস?

সত্যি! ঘরটার পরেই যে ছোট্ট উঠোনটুকু—তার চারিদিকে উঁচু পাঁচিল—একটামাত্র বড দরজা—নাটু তাতে ভিতর থেকে তালাচাবি দিয়ে এসেছে। বাঃ, নাটু মোড়ল বেশ হুঁসিয়ার। বারুণী বলল—

—অঃ মুড়ল, তা'হলে বিশ্বেস করলে না—বল ?   বেশ ।

সাবধানে বিড়ি তিনটি আর দেশলাইটা নিয়ে ও বেরিয়ে এল—, জলের ঘটিটাও নিল হাতে। নাটু ঘরের মধ্যে বস্তাটায় বসে তামাক টানছে। বারুণী উঠোনে নামলো। ঘাস আর জঙ্গল উঠোনটায়। একপাশে এসে মুখটা ধুলো বারুণী—জল খেল খানিকটা। নাটু ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্তে তামাক খাচ্ছে। বারুণী আস্তে এগিয়ে এসে ঘরের দরজাটা টেনে দিতে দিতে বলল,—লাজ লাগছে মোড়ল—কাপড়টো ছাড়বো হে—দুয়োরটো একটুস বন্ধ করছি।—নাটু হাসলো। বারুণীদের মত মেয়েরও লাজ লাগে। বারুণী বাইরে থেকে দরজাটা টেনে শিকল তুলে দিল। যে তালাচাবিতে এতক্ষণ বারুণী বন্দী ছিল, সেটাও রয়েছে—চট্ করে বারুণী তালা বন্ধ করে দিল ঘরে। ভিতরে লণ্ঠন, বাইরে জ্যোৎস্না; নাটু তখনো নিশ্চিন্তে ভাবছে, বারুণী কাপড় ছেড়ে আসবে এখনি। হঠাৎ বারুণী বাইরে খিলখিল করে হেসে উঠল।...কেমন! দেখ আখুন মজাটি—মজাটি দেখ আখুন... বলেই বারুণী দরজাটা একটু ঠেলে দিল ভিতর দিকে—দুপাট কপাটের মাঝের ফাঁক দিয়ে বলল,

—ইবারে! থাক্ হারামজাদা মুড়োল...তুর কুন বাবা আছে দেখি... বারুণী বিড়ি মুখে দিয়ে দেশলাই জ্বালল।

নাটু এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। সভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ই কি রে বারুণী! খোল— খোল—খুলে দে! বারুণী... !

—এই যে, দি খুলে—জন্মের মতন খুলে দিলোম..। হঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ...এই লাও !

বিড়ি ধরানো দেশলাই-কাঠিটা বারুণী ঘরের চালে ঠেকাচ্ছে। আতঙ্কে নাটু চীৎকার করে উঠলো—তোর পায়ে ধরছি বারুণী—খুলে দে, খুলে দে—।

—হিঃ হিঃ হিঃ ;—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—প্রেতিনীর মত হাসছে বারুণী।—দেখুন গো—মোড়ল—মজাটি ক্যামন লাগছে ?

গতকালের ভিজে চাল—আজও ভালরকম শুকোয় নি, ধোঁয়াচ্ছে—বারুণী উঠোনের মাঝে এসে বিড়ি টানতে লাগল। কিন্তু বারুণীও বেরিয়ে পালাতে পারবে না—উঠোনের ওদিকে সদর দরজা বন্ধ; তবে বারুণী উঠোনে রয়েছে—তাই অনেকটা নিরাপদ। নাটু দরজার ফাঁকে কাতরস্বরে বলছে,

—তুর পায়ে পড়ি বারু—খুলে দে—তু যা চাইবি, তাই দিব—বারু, দে খুলে—ওঃ পুড়ে মরলোম—আগুন—আগুন! ওবে কে আছিস,—আগুন—নাটু সজোবে চীৎকার করছে।

—হিহিহিহিঃ—প্রেতিনীর হাসি।—ঘরে কুলুপ দিয়ে রাখার মজাটি দেখ মোড়ল—দেখছো!

বারুণী বিড়িটায় জোরে টান দিল। নাটুরই বৈঠকখানায় ছিল কুমদীশ, শম্ভু, হরি—তখনো ওরা তামাক খাচ্ছিল! 'আগুন' কথাটা শুনেই বেবিয়ে এসে দেখলো, রাত্রির জ্যোৎস্নাকে ম্লান করে আগুনের ছটা আসছে নাটুবই গোয়ালের ওদিক থেকে। ছুটে এসে ওরা দেখলো—সদর বন্ধ। পাঁচিলে উঠে ওরা তিন জন দেখলো—বারুণী উঠোনে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে আর নাটু জ্বলন্ত ঘরেব মধ্যে থেকে চীৎকার করছে। লাফ দিয়ে এপাশে নেমে পড়ল ওরা—বলল—দে···, চাবি দে বারুণী—চাবি দে! বারুর হাতের চাবিটা ওরা কেড়ে নিতে গেল। বারুণী সজোরে ছুঁড়ে দিল সেটা ঝোপজঙ্গলেব মধ্যে, খিল খিল করে হেসে উঠলো আবার—তারপর মুখের বিড়িটার আগুনেই আরেকটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বলল—মরুক আঁটকুড়ির ব্যাটা—লিব্বংশ যাক্···হিহিহিঃ!

বারুণী ছোট জাতের মেয়ে। ঘরে ও তালাবন্ধ ছিল, এখন উঠোনে। এই পাঁচিল ডিঙ্গুতে ওর কিছু এমন কষ্ট হোল না। এদিকে যখন কুমুদীশরা দরজা ভেঙে নাটুকে বার করবার চেষ্টা করছে, তখন ওদিকে বারুণী সেই বড় খাসীটার উপর একটা পায়ের ভর রেখে টুপ করে উঠে পড়ল পাঁচিলের

উপর—তার পর লাফ দিয়ে এপাশে। তারপর বিড়িটা টানতে টানতে বারুণী নদীর কিনারায় চলে এল।

গোয়ালঘরের দরজা—খুব বেশী শক্ত কাঠে তৈরী নয়—তিনজনে লাথি মেরে ভেঙে নাটুকে যখন টেনে বার করলো—তখন ঘরের চাল বেশ জোরে জ্বলে উঠেছে—নাটুর অঙ্গের দু'চার যাযগা ঝলসে গেছে; নাটু অজ্ঞান। গভীর স্তব্ধ রাত্রি, কিন্তু তখনো নদীর শরঝোপ আর কাশবনের মধ্যে বারুণীর হাসি প্রেতিনীর মত শোনা যাচ্ছে—হিহি হিঃ!—দেখুক মজাটি ক্যামন—হিঃহিঃহিঃহিঃ!

*　　　　*　　　　*

মাতাল রাজু টলতে টলতে ঘরের দরজায় এসে দেখলো—ময়না তার জন্যে বিছানা পেতে রেখেছে—খাবার ঠিক করে ঢাকা দিয়ে রেখেছে—কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আলোটা জ্বলছে আর ময়না ঘুমিয়ে গেছে। ময়না বড্ড ঘুমকাতর। ঘুমুতে পেলে ও আর কিছু চায় না; আর ঘুমুলে ওকে ডেকে জাগানোই মুস্কিল—জাগে না।

—ময়না!—রাজু ডাক দিল। উঁঃ···ময়না উঠে বসছে একটি ডাকে। আশ্চয্য! ময়নার ঘুম এত পাত্‌লা হোল কি করে! ওঃ, ওকে যে এবার থেকে সজাগ ঘুম ঘুমুতে হবে! ওর যে এখন সাবধান হ'য়ে ঘুমুবার সময়! ময়না স্বভাবতঃই শারমেয-নিদ্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে!

—যাই বাবু···ময়না উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে। একি? কাকে সাড়া দিচ্ছে ময়না? ও, ওর সেই বাবুকে—সেই ঠিকেদার সায়েবকে মনে করেছে। হ্যাঁ, শয়নে স্বপনে ময়না তার কথাই ভাবে এখন!

—উঠ ময়না; আমি···রাজু বলল আবার।

—দাদা! এত দেরী করলে যে! ময়না দরজা খুলল।

—হুঁ—হোল দেরী একটুক্। খেইছিস তু?

—না, আমি খাব না কিছু। বৌদিদি খুব খইয়েছে।—তুমি খাও, তুমাব লেগেও এনে বেখেছি।

রাজু আর বেশি কথা বলল না—কথা বলতে ওর ইচ্ছে কবছে না। মানুষের জীবনের ওপব ওর যেন ভীষণ বকম একটা আক্রোশ এসে গেছে—বিশেষ করে মেয়েদের উপর।

খিদেও বিশেষ ছিল না—বাজু মুখ ধুযে খেতে বসল—সামান্য কিছু খেযে উঠে হাত ধুয়ে এলো, তাবপব শুযে পড়ল। মযনা এঁটো তুলে হাত ধুযে ওর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বলল—ঘুমুলে দাদা?

—না···নেটো মোড়ল বারুকে কুলুপ দিযে বেখেচে গোয়ালঘবে, দেখে এলোম।

—কেনে? নাটুব কি দোষ কবল বারুণী আবাব?

—দোষ কি আবার! বারুণীকে কিনে লিয়েছে নেটো মোড়ল। তুইও আব ইকলা যাসনা ঐ কাবখানাতে কখনো, বুঝলি?

—না গেলে চলবে কি কবে দাদা·? মযনা ভয়ে ভয়ে বলল। আবার—কাল একবার যেতেই হবে যে।

—না! আমি ঘব চালাবো কুনো বকমে। যা হবাব হইছে—তু আব যাস না।

ময়না ভয় পেয়ে গেল। কি হয়েছে? কি এমন হওয়াব কথা জেনেছে দাদা? সবই জানতে পেবেছে নাকি? আস্তে আস্তে বলল,—বেশ দাদা—কাল একবাব যেয়ে ছুটি নিয়ে আসি গা।

—বেশ, আমি সঙ্গে যাব।—রাজু কথাটা বলে চাইলো ময়নাব মুখের দিকে। ময়না যেন পাথরের মূর্ত্তি একটা—শক্ত হয়ে গেছে ওব সর্ব্বাঙ্গ, অথচ কাঁপছে—রাজু ওব পিঠে হাত রেখে বলল—সব আমি বুঝেছি ময়না! মা-মরা তুখে আমি মানুষ করেছি—আমি সয়েই গেলুম তবে, লুকের কাছে মুখ দেখাতে লাববো আর—সেই কথাটোই ভাবছি!

ময়নার পাথরের মতন গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কথা ও আর কইতে পারবে না।

—কাঁদিস না ময়না—থাক—হোক যা-হয়—ভগবানের যা ইচ্ছে, হোক !

অকস্মাৎ ময়না দাদাব কোলের ওপর লুটিযে পডলো। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে—দুলে দুলে উঠছে ওর সর্ব্বাঙ্গ। রাজু সেই ছোটবেলার মতন ওকে কোলে নিয়ে উঠে বসল—মাথার খোলা চুলে হাত বুলুতে বুলুতে বলল —কাঁদিস না—বোনটি—ভাবনা কি ! তুর সব দোষ ক্ষমা করবো আমি। তুব জন্যে লাখোবার মরতে পারি, বাঁচতে পারি ময়না ; কিছু ভাবিস না··· গাঁ ছেড়ে চলে যাব কাল।

এই পরম স্নেহশীল দাদার বুকে শেল হেনেছে ময়না—ওঃ ওঃ ! ময়না কি বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেবে ! কান্নায় আকুল হ'য়ে উঠলো ময়না আবার—দাদা দাদা আমার ! কতক্ষণ ময়নাকে কোলে নিয়ে বসে আছে বাজু কে জানে—বাইরে থেকে বারুণী ডাকলো,

—ময়না !—ও ময়নামতী, মযনামতী, মযনামতী লো—ভো-র হোল-লো ; খাটুতে চ-লো, মযনা লো !

—আয়। ময়না দাদাব কোল থেকে উঠে চোখমুখ মুছে দরজা খুলে খুলে দিল। বারুণীর বেশ-বাস অদ্ভুত। শ্মশান থেকে যেন আধপোড়া মডা উঠে এসেছে ! গা-ময় কালি।

—কুথা ছিলি লো ? তুখে নাকি নাটু মুডল বেঁধে রেখেছিল ?

—হুঁ, রেখেছিল। নাটুকেই আমি আবাব বেঁধে রেখে এলোম। চ—যাবি না খাটতে ?

—হুঁ যাব। কিন্তু তুর গায়ে অত কালিঝুলি কেনে ?

—আঁটকুডো নাটুর ঘর জ্বালায়ে আগুন দিয়ে এলোম যে মুখে—সেই কালি, লে চা কর, খাই।

রাজুর একটু তন্দ্রামত এসেছিল হয়তো! ওদের কথায় সেটুকু ভেঙে গেল। বলল—কি করে খালাস হলি বারু? ছেড়ে দিলে নাকি তুথে?

—না রাজু দাদা—ছেড়ে দিবে নাটু মুডল—তা হলে আর লয় কি! কি করে এলোম—শুনবে কাল সকালে।

ময়না চা তৈরী করলো—সবাই মিলে খেল—বারুণী ঐখানেই হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নিল—তারপর নিত্যদিনের মত ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল অজয় নদীর দিকে।

* * *

—কয়েকটা দিন কেটে গেল। শ্রাবণ শেষ হয়ে ভাদ্র পড়েছে, আজ জন্মাষ্টমী। রাজু বারণ করেছিল কিন্তু ময়না আজো গেছে ওপারে। একলা ঘরে রাজু চুপচাপ বসে বসে চা খেল খানিকটা। গাঁয়ে আজকাল আর বেরয় না রাজু—কে জানে কে মুখ ফেরাবে, কে কুৎসিত রসিকতা করবে! শঙ্করের ঘরও যায় নি সেইদিন থেকে, কিন্তু আজ মনে হোল—তারণ ঠাকুরের ঘর একবার যাওয়া দরকার। আজ জন্মাষ্টমী—দিদি-ঠাকরোণ উপোস করে আছে—কিছু চাল আর তরকারী দিয়ে আসবে রাজু। তা ছাড়া মাখনের জমির ধানগুলোও একবার দেখে আসা দরকার। ধানগুলো তো রাজুই পাবে। চাল, তরকারী নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে রাজু বেরুলো। তারণ ঠাকুরের ঢেংা বৌটা শীলে মশলা বাঁটছে—রাজুকে দেখে মাথার কাপড়খানা টেনে দিল। শীর্ণ হয়ে শুকিয়ে গেছে বৌটা। মুখখানা এমন করুণ যে দেখলেই মায়া করে। খাওয়া হয় নাই হয়তো দু'চার দিন। রাজু বললো—কি বাঁটছো বৌঠাকরোণ?

—পান্‌ফল। ঠাকুরঝির লেগে পালো করবো—বৌটা আস্তে বলল। ওর বড় বড় চোখ দুটো রাজুর চাল-তরকারীর দিকেই।

—এই লাও চাট্টি চাল। বলে রাজু নামিয়ে দিল ঝুড়িটা—দিদি কৈ? ঠাকুরঘরে গেইছে নাকি?

—হুঁ—বসো। বৌটা উঠে চালের ঝুড়িটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল অতি কষ্টে। ঐ ক'টি চালের ছোট্ট ঝুড়ি—তাও তুলতে পারছে না—এমনিই দুর্ব্বল হয়ে গেছে। মরেই যাবে হয়ত এবার। আহা, তারণ ঠাকুর বড্ড ভালবাসে বৌটাকে। যদি মরেই যায়—না, মরবে কেন? ভগবান বাঁচিয়ে রাখবে ওকে। বৌটা বাইরে আসতেই বলল,—চললোম বৌঠাকরোণ—দিদিকে বলো···

—না রে, যাবি কেনে—বোস—দিদিই বললো ঘরে ঢুকতে ঢুকতে—ময়না কেমন আছে?

—ভালই—বসবো না আর দিদিঠাকুরোণ—যাই।—রাজু বেরিয়ে পডল ক্ষেতপানে।

—এইখানেই খেয়ে যাস—বুঝলি রাজু—আজ তুরা ভাইবোনেই খাবি এইখানে।

—হোক, আসব—বলে রাজু বেরিয়ে গেল।

দিদি বলল বৌকে—আগুতে ভাত চাপাও দেখি—তা বই পান্‌ফল বাঁটবে।

—হুঁ—বৌ অতি কষ্টে উঠছে। উন্থনটা জ্বলছিল খামোকা। পাড়াপড়শী জ্ঞাতিশত্রু সব পাছে জানতে পারে যে এদের চাল নাই বলে রান্না হয়নি—তাই দিদি খামোকা আজ তিন-চারদিন উন্থন জ্বেলে ধোঁয়া করে দেয়—লোকে জান্থক যে ভাত চড়েছে। আজ সত্যি ভাত চড়বে;—ভাত,—ভাতের মত বস্তু নাই আর কিছু—কিছু নাই আর। ভাতারের চেয়েও ভাত বড—ভাতের জন্যই তো ভাতার। আজ ভাতের মূল্য ভাল করে বুঝতে আরম্ভ করেছে মান্থষ—মান্থষ, যারা মন্থর সন্তান, মান-মর্য্যাদা সম্বন্ধে হুঁস যাদের অতিরিক্ত সজাগ—সেই মান্থষ আজ একমুঠো চালের কাঙ্গাল—মানমর্য্যাদা সব খুইয়েও একমুঠো চাল চায়—একমুঠো ভাত চায়। ভাতারের চেয়েও ভাত আজ মিষ্টি হয়ে উঠেছে ওদের কাছে।

রাজু পথে নামলো—নদীধারে মাখনের জমিটা দেখে আসবে একবার। ময়নার পাপার্জ্জিত চাল দিয়ে আজ জন্মাষ্টমীর দিনে কিছু পুণ্যও সে সঞ্চয় করলো। গোলাপী চলছে! গোলাপী যাচ্ছে নাটুর বাড়ীর দিকে; হাতে কয়েকগাছা রেশমী চুড়ি—সেদিন ঝুলনের মেলাতে কিনেছে হয়তো। ঈশান মরে সুবিধে করে দিয়ে গেল—বাঃ বেশ!

এই নারী—এ-ই সতীসাবিত্রীর জাত—এদেরকেই মা-বোন-বৌ বলে ডাকতে হয়! রাজু হাসলো ব্যঙ্গের হাসি—চল্লি কুথাকে গুলাপী? হাতে যে একহাত চুড়ি!

—চল্লোম—যে কাজ কত্তে ময়না যায়—গোলাপী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রত্যভিবাদন জানালো। নির্ব্বোধ রাজু কেন গেল গোলাপীকে খোঁচা দিতে! গোলাপী সইবে কেন! রাজু ধুলোপড়া-পাওয়া সাপের মত মুখখানা নামিয়ে চলে গেল।

মাখন ডোমের ধানক্ষেত। আলের উপর দাঁড়িয়ে দেখলো রাজু—ভাদরের রোদে আর হাওয়ার ধান গাছগুলো বেশ ঝাড়িয়ে উঠেছে—ঘনশ্যামল রং—উপরে সুনীল শারদাকাশের ছায়া পড়ে এক আশ্চয্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছে। দুলছে ধানের ঢেউ—কচি শীষগুলোর পেটে এখনো চাল দানা বাঁধে নি—তাই খাড়া আছে ধানগাছ—সরু সরু পাতাগুলোন সাগর-তরঙ্গের মতই ঢেউ খাচ্ছে। দূরদিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র—নয়ন-জুড়ানো মা-লক্ষ্মীর আঁচল যেন—রাজু নির্নিমেষ হয়ে দেখল। হাঁ, দেখবার মত বস্তু। মানুষের খাদ্য, মানুষের রুধির, মানুষের জীবন—অজস্র, অনন্ত হয়ে আজ দোল খাচ্ছে। আর ক'টা দিন। রাজুরা সব এসে কেটে নিয়ে যাবে—ঘরে তুলবে পাকা ধান। পাকতে আর কটাইবা দিন!

মাখন এই ধানগাছ পুতে গেছে—মাখন আজ নাই। আহা—এই ক্ষেতভরা ধান ও চোখে দেখতে পেল না—দু'টা টাকা বালিশের তলায় গুঁজে রেখে মাখন না-খেয়ে মরেছে—তিলে তিলে মরেছে।

মাতা বসুমতী আজ সেই মাখনের ক্ষেতে প্রচুর ধান ফলিয়ে দিয়েছেন। শুধু মাখনের ক্ষেতে নয়—সবারই ক্ষেতে—হাজার হাজার বিঘে ধানক্ষেতে। রাজু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল—ঐ ওদিকে অজয়ের কিনারা—এদিকে ঐ দূরে দেয়াগঞ্জ—পূর্ব্বদিকে গ্রাম আর উত্তরে কত—কতদূর পর্য্যন্ত ধানক্ষেত। অত ধান কাটবে কে? অত জন-মুনিষ পাওয়া যাবে কোথায়—সব তো মরেই গেল—কাটবে কে এতো ধান?

কয়েকটা বিষ-লাঙ্গুলের ফুল ফুটে রয়েছে আলের উপর। চমৎকার লাল লাল ফুল। কিন্তু বিষ—খেলে আর রক্ষে নাই। রাজু তুলে নিল দু'টো ফুল—কানে গুঁজলো। তারপর ফিরতে লাগল। মাখনের জমিতে অজস্র ধান হয়েছে—রাজুই পাবে ধানগুলো, রাজুকে দান করে গেছে মাখন—কিন্তু দলিল তো কিছু নাই। জমিদার যদি না দেয়—কেড়ে নিয়ে যায়? নেবেই তো। রাজু তো মাখনের ছেলে নয় যে উত্তরাধিকারী হবে তার ক্ষেতের; নেবে জমিদারই। নিক গে! রাজু জীবনের সাধনা আর করতে চায় না। জীবন রাখবার জন্য অত চিন্তার দরকার নাই তার। কিন্তু এখনি রাজু ধানগুলো দেখে লুব্ধ হচ্ছিল। জীবনের সাধনা ত্যাগ করা কি অত সহজ?

রাজু ফিরছে—একা ঘরে ফিরে আসতে মন চায় না—বাঁশী বাজানো ছাড়া ঘরে আর কোনো কাজ নাই। করবে কি গিয়ে ঘরে? কিন্তু যাবেই বা কোথায়? রাজু আস্তে আস্তে হাঁটছে; রাস্তাটা যেন ফুরিয়ে দিতে চায় না ও—রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার সুখটা উপভোগ করছে। কদিন বেরুয় নি—আজ যেন প্রবাস-প্রত্যাগতের মতই মনে হচ্ছে গ্রামের চিরকালের চেনা পথ। তবুও রাস্তাটা ফুরিয়ে গেল—রাজু ঘরের কাছে এসে দেখল—ময়না ফিরে এসেছে—ঝিমুচ্ছে। অবাক হ'য়ে রাজু বলল—কি হোল ময়না? এত সুকালে যে আজ? উকি! কাঁদছিস কেনে র‍্যা?

ময়না দাদার কোলে এসে পড়ল অকস্মাৎ।—দাদা!—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ময়না। রাজু বিস্ময়ে বেদনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো;—হোল কিরে?—কেউ কিছু বলেছে? লক্ষ্মী সোনা, বল!

—হুঁ—ভেবেছিলোম, ওদের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করবো—টাকা না দিলে প্যাটে ছেলে নিয়ে কুথাকে যাব আমি! তাই বলেছিলোম কাল—ময়না আবার কাঁদতে লাগল। রাজু মাথায় ওর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—দিল না শালারা, লয়? না দেক গা—কাঁদিস না বুনটি। আখুনো আমি বেঁচে আছি—ভয় কি তুব! আমি সব ব্যবস্থা করবো।—রাজু ওকে সান্ত্বনাই দিচ্ছে, কিন্তু কী ব্যবস্থা করবে সে!

—না—কাল বলেছিল—আজ দিবে কিছু টাকা আমাকে। আজকে গেইছিলোম তারই লেগে—কিন্তুক ওরা আজ আর ঢুকতেই দিলো না—দবয়ান দিয়ে অপমান কবে, তাড়াইয়ে দিলে ওঃ দাদা!

ময়না অত্যন্ত কাতর ভাবে কাঁদছে।—কেনে ইমন কাজ কত্তে গেইছিলোম দাদা—উঃ···দাদা, তুমার পায়ে পড়ি, আমাকে বিষ এনে দাও, আমি মরে যাই দাদা!

ছোট্ট খুকীর মতন ওকে বুকে তুলে নিল রাজু। ভিজে একটা গামছা দিয়ে ওর মুখ-হাত পা সযত্নে মুছে দিতে লাগল। ময়না ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায়। রাজু ওর থুত্‌নাটায় দেখলো—একটি ছোট্ট উল্কী আঁকা। বহুদিন হোল সে-বছব গোষ্ঠের মেলাতে ময়নাকে সখ কবে বাজু উল্কী পবিয়ে দিয়েছিল—কপালে একটি টিপ আর থুত্‌নীতে একটি টিপ! ওর গোরা মুখে চমৎকার দেখায়। গামছা দিয়ে মাজতে মাজতে রাজু লাল করে তুললো ওর মুখখানা। দু-আড়াই বছরের মেয়েকে যেমন করে মা পরিষ্কার করে, ঠিক তেমনি করে রাজু ওর ছোট্ট বোনটিকে মার্জিত করলো—তারপর ওকে বসিয়ে নিজেই সেদিনকার কেনা তাঁতী-বাড়ীর কাপড়টা আলনা থেকে এনে বলল,—পর—চল—ঠাকুরের ঘর যাব।

ময়না অনেকটা সামলেছে—বললো—কেনে? ঘরে ভাত রাঁধবোনা?

—না—দিদিঠাকরোণ খেতে বলেছে—চল, উখেনে বৌঠাকরোণের সঙ্গে গপ্প করবি—উঠ দেখি।

ময়না উঠে কাপড় পরলো—ছোট্ট আয়নায় দেখে নিল একবার নিজেকে। কোমরের কাপড়টা খুব আঁট করে পরেছে। রাজু বলল—ছেলেটো তুরই ময়না—অমন করে কাপড় আঁট করছিস কেনে! আলগা দে।—কথাটা যেন ময়না শুনতেই পায়নি। কুঁড়ের দরজায় তালা দিয়ে বলল—চল দাদা···।

গ্রামের পথে লোক আর চলে না বললেই হয়—হয় পালিয়েছে নয় মরেছে। রাজু আর ময়নার সঙ্গে এই ভর্ত্তি দুপুর বেলা কারো দেখা হল না পথে। তারা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ছে।

দিদির উপোস—বৌটা তখনো খায়নি—রাজুর জন্য অপেক্ষা করছে। ময়না ভিতরে ঢুকে বলল···বৌদি!

রাজু ময়নাকে পৌছে দিয়েই আবার বেরিয়ে গেল—কোথায়, কে জানে।

—আয়! বৌ আদর করে ডাকলো ওকে। ওর অপরাধী বুকখানি ধুকধুক করে সদাসর্ব্বদা। কে জানে, কে ওকে কতখানি ঘৃণা করে; কিন্তু এই ঢ্যাঙা বৌটা ঘৃণা করে না—ভালোই বাসে; ময়না জানে, তাই এখানে ও বেশ সহজ হতে পারে। খানিকক্ষণ গল্প করে ময়না বলল—দাদা আবার গেল কুথাকে?

আসুক—আয়, তুখে খেতে দি। পোয়াতী মানুষ···আর বিলা করে কাজ নাই—বোস্।

লজ্জার একটা লালচে আভা ছড়িয়ে গেল ময়নার মুখে। 'পোয়াতী মানুষ', ছিঃ! ও কথা কি তার সম্বন্ধে অমন আদরে উচ্চারিত হবার কথা! বললো—তুমার পায়ে পড়ি বৌদি, উকথা বলো না! বড্ড লাজ

লাগে আমার। প্যাটের দায় বড্ড দায় বৌদি···তাই···আর বলতে পারে না ময়না।

বৌটাও থেমে গেল। ওরও দুঃখ হল অজান্তে আঘাত দেওয়ার জন্য। রাজু ফিরে এল। ময়না শুধুলো—কুথাকে গেইছিলে দাদা? বিলা এনেক হোল, খাও!

—হুঁ—দাও বৌঠাকরণ। গেইছিলাম একবার কিষ্টে শালার কাছে। শালা ভেগেছে।

—কুথাকে গেল আবার! গাঁয়ে নাইখো?

—না, শঙ্করের বৌ জবাকে নিয়ে ভুর বেলা চলে গেইছে। শঙ্কর বসেবসে তাড়ি টানছে আর বলছে···'দেখ লেঙ্গা! দুকুড়ি তিন ঢাকা লগদ—খাড়ু বাউটি আর মাকড়ি—সব নিয়ে গেল!'

—হু—গেল কুথাকে তাহলে! অ, বুঝেছি দাদা···জবার সঙ্গে শঙ্কর-দাদার বনতোই না যে···কিষ্ট তাহলে বদ্ধমানে, ঐ যে লাইন ভেঙ্গেছে—উখেনেই গেল খাটতে। মিলা সব লুক লাগছে উখেনে। আমি আর খাটতে লারবো দাদা—না হলে যেতাম··। ময়না চুপ করল।

—হুঁ—রাজু চুপ করে রইল খানিক। তারপর বলল—

—চ—আমরাও যাই; খাটালি পেলে আমি তো খাটতে পারবো।

—না দাদা। তার থেকে তারণ দাদার কাছে চল—কলকাতা, সি বরং ভাল।

—কলকাতা?—রাজু চমকে উঠলো। মনে পড়ে গেল তারণ ঠাকুরের 'কদমফুল'এ পড়া সেই মোদকের দোকান—সেই ফুটপাতের প্রসূতি। ময়নাও তাই হবে না তো! না—না, কলকাতা নয়। কলকাতায় রাজু ময়নাকে নিয়ে যাবে না। কিন্তু নিয়ে যাবে কোথায়? গাঁয়ে তো প্রসব হতে দিতে পারবে না—তাহলে করবে কি রাজু? কোথায়

যাবে? রাজু যেন ভুলে যাচ্ছে মুখে ভাতের গ্রাস তুলতে! দিদি উপোসী গায়ে একদিকে শুয়েছিল; আড়মোড়া ভেঙে' বলল,—কলকাতা কিসের লেগে যাবি? উখেনে আবার যায়! তার চেয়ে ঘরে থাক···যা হয় হবে।

কিন্তু ময়না থাকতে চায় না ঘরে। রাজুরও ইচ্ছে নয়। কারণ গাঁয়ে এখনো ময়নার সম্বন্ধে মুখ-ফুটে কেউ কিছু বলছে না—কুমারী ময়নার ছেলে হলে সেদিন কিন্তু আর মুখ বন্ধ করবে না কেউ। রাজু বলল—কলকাতাই যাই দিদি ঠাকরোণ। উখেনে দাদা ঠাকুর যা-হয় করবে কিছু উপায়। ময়না বলল—হুঁ···উখেনে বড় সহর, কত লুকের কত হয়· আমাকে লিয়ে চল দাদা—ইখেনে আমি বাঁচবো না!

ময়নার অন্তরের লজ্জাটা অনুভব করছে রাজু। সস্নেহে বলল,—চল, তাই যাব।

খেয়ে ঘুমিয়ে বিকেল কবে রাজু গেল বাইরে—ময়না আরো খানিকক্ষণ থেকে গল্প করে নিজের ঘরে ফিরে এল। রাজু যখন ঘরে ফিরলো তখন রাত অনেকটা—এসেই বলল,

—ঘুমুয়ে লে খানিক। হে কাটোয়া দিয়ে ঘুরে যেতে হবে কলকাতা। ইদিক্‌কার টেন নাই—লাইন ভেঙেছে।—বলেই রাজু শুলো। ময়না বুঝলো, রাজু ধেনো মদ খেতে গিয়েছিল। কিছুই বলল না সে। জিনিসপত্র গুছিয়ে শুলো কিন্তু ঘুম ওর আর আসবে না। আর কখনো এ গাঁয়ে—এই ওর জন্মভূমিতে ফিরতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না ওর। যে ব্যাপার আজ আনন্দের তুফান তুলতে পারতো, সেই ঘটনাই আজ ময়নাকে চোখের জলে ভাসাচ্ছে। অনেক—অনেকক্ষণ ময়না চুপচাপ শুয়ে রইল। চোখের জলে ওর তেলচিটে বালিশটি ভিজে গেছে। রাজু জেগে বলল—রাত কতটো আছে রে ময়না—ভোরের তারা উঠেছে?

—হুঁ—উঠো—একটুস চা খেয়ে লি—ময়না উঠে উনুন জ্বালাল। কে জানে, এই আগুনই এ বাড়ীর শেষ আগুন কি না!—চা খেয়ে

ময়নার তোরঙ্গটা পিঠে ঝুলিয়ে রাজু হাতে নিল বই ক'খানি—পিছনে ময়না। রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠছে শিশু-ভানুর জন্ম-সম্ভাবনায়—ময়নার গর্ভস্থ ভ্রূণ কেঁপে কেঁপে উঠছে সেই বিমল আলোকের আকাশে আঁখি মেলবার জন্য। নদী-কিনার ধরে পাকা সড়ক। অজয় গিয়ে মিলেছে মাতা ভাগীরথীর অঙ্গে—সেদিকের পথ অনেক দূর। তাই এখানকার স্টেশনে গিয়ে ভোরের ট্রেণ ধরলো ওরা—তারপর দুপুর নাগাদ একটা জংশন স্টেশনে পৌছে আবার ছোট লাইনের ট্রেণ ধরে এল কাটোয়া। মা গঙ্গার কূলে এই কাটোয়া— ; মহাপ্রভু নাকি মস্তক-মুণ্ডন করেছিলেন এইখানে—তাই এ জায়গা তীর্থভূমি—তাছাড়া মা ভাগীরথী তো আছেনই।

একখানা মাত্র ট্রেণ কলকাতা যাবার—বহু চেষ্টা করেও রাজু তুলতে পারলো না ময়নাকে। থার্ড ক্লাসে তো নয়ই···ইণ্টারেও না। ট্রেণ চলে গেল। স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে কাল পর্য্যন্ত এই ট্রেণের অপেক্ষায়! ময়না বলল—চলো দাদা—গঙ্গাচান করে আসি।

—যাবি—চল!—তখনো অনেকটা বেলা ছিল। ভাইবোনে ওরা গঙ্গার কিনারে এসে পৌছাল। দুর্ভিক্ষের দুঃখটা যেন এখানে আরো বেশি প্রকট—যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে একেবারে।

—"দে বাবা দুটো পয়সা—দাও বাবা ফ্যান একটু"—ওঃ, কাণ পাতবার যো নাই—ছোট শহর, তাতেই যত গেঁয়ো ভিখিরী এসে জুটেছে। নির্ম্মম হয়েই রাজু আর ময়না চলে—দান করবার মত ওদের আর সম্বল নাই। গঙ্গায় স্নান করতে নামবার পূর্ব্বেই কিন্তু ময়না কাতরভাবে বসে পড়ল।

—দাদা,—উঃ!—শুয়ে পড়ল ময়না একটা আমগাছের তলায়। ওর নীচেই মা গঙ্গা। রাজু বুঝলো, ময়নার ব্যথা আরম্ভ হয়েছে। কি উপায় করবে এখন! বড়ই ভাবনায় পড়ল রাজু। প্রসবের কিছুই রাজুর জানা নাই—এ জায়গাটায় লোকজনও দেখতে পেল না!

কিন্তু কিছুই দরকার হোল না—ময়না অল্প কষ্ট পেয়েই প্রসব করলো একটি ছেলে। আহা! কি সুন্দর! যেন একরাশি পদ্ম ফুল। কী রংই না হয়েছে! ছেলেটাকে দেখে রাজু খুসী হয়ে উঠলো। "সুন্দর শিশু আনন্দের উৎকৃষ্টতম অবলম্বন"—কিন্তু ওর নাড়ীচ্ছেদ করতে হবে!—অস্তসূর্য্য পশ্চিম গগন থেকে আশীর্ব্বাদ করছেন যেন! যেন বলছেন—"কাল আবার দেখা হবে—আমি আলোক, আজকার নিঃসীম অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করিস বৎস—আমি আবার আসবো; আঁধারের পরই আসি আমি—আমি তোদের জীবন-দেবতা—আমার আগমনী গান গাইতে গাইতে এই আঁধার রাত্রি অতিবাহিত কর!"

—ময়না! ময়নামণি!—রাজু ডাকলো।

—হুঁ—উঁ—দাদা!—ময়না সাড়া দিল। ছুরি নাই সঙ্গে। রাজু গঙ্গার কিনারায় খুঁজে একটা ঝিনুক এনে নাড়ি কেটে দিল ছেলেটার। ছেঁড়া কাপড় দিয়ে নিজের হাতে মুছলো ওকে—তারপর দেখতে লাগল। কী চমৎকার ছেলে! ওর বাপ নিশ্চয় খুবই সুন্দর—আর ময়নাও তো কম সুন্দর নয়! রাজু একে মেরে ফেলতে গিয়েছিল—ছিঃ! রাজু ওকে মানুষ করবে—ওকে বড় করে তুলবে রাজু—। আগামী প্রভাতের ঐ আলোক-বিন্দুটুকু রাজু পরম যত্নে জাগিয়ে রাখবে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মত। ঐ অগ্নিকণাই একদিন বিশ্বধ্বংসী শক্তিতে পরিণত হবে—বিশ্বকে নবীনভাবে সৃষ্টি করবে।

ময়নাকে কিন্তু একটু দুধ খাওয়াতে হবে। বড্ড যেন দুর্ব্বল হয়ে গেছে ময়না; কিন্তু পাবে কোথায় দুধ! বাজার দূরে—হোক, রাজু একছুটে গিয়ে নিয়ে আসবে। ময়না বেশ সুস্থ রয়েছে, বলল,—আমি আসছি বোনটি, থাক তুই।

রাজু ছুটলো দোকানের সন্ধানে। কোথায় দোকান? অনেক অনেক দূর! রাজু নিরাশ হয়ে ফিরছে—হঠাৎ একটা দোকান। চার আনার

দুধ নিল একপোয়া—মাটির গেলাসে চলকে পড়ছে দুধটুকু ; আস্তে হাঁটছে রাজু। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

সদ্যপ্রসূতির গায়ের গন্ধ—রক্তের আস্বাদ-পাওয়া দুটো খেঁকী কুকুর এসে উপস্থিত। দুর্ব্বল ময়না কিছুতেই তাড়াতে পারছে না তাদের। কচি ছেলেটাকে ওরা কামড়ে খাবে নাকি? ময়না অবশ হাত দিয়ে বার বার চেষ্টা করলো তাড়াতে—পারলো না। কুকুর দুটো বড্ড শয়তান। ময়না ছেলেটাকে আগলালো নিজে তার উপর উবুড় হয়ে শুয়ে—কুকুর দুটো রক্ত মাখা দেহটাকে ছিঁড়তে লাগল! ময়না আর বাধা দিতে পারছে না—সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে ওর—উঃ!

—দাদা—ও দাদা—দাদা গো···উঃ মা!

শুনতে পেয়েছে রাজু—ছুটছে—ছুটেই এসে পৌঁছাল।

—ময়না!

নাই ময়না, নাই। সত্যি নাই! দূরে কুকুর দুটো তখনো লোলুপদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ময়নার দেহটাকে আকুল আবেগে কোলে টেনে নিল রাজু—ওর বুকের তলায় কচি ছেলেটা কেঁদে উঠলো,।

—টুঁ—য়াঁ—টু—য়াঁ—!

জীবনের জয়গান—জীবন-দেবতার নির্ম্মম, নিষ্ঠুর জয়গান! চোখে জল নাই রাজুর। চোখ দুটোতে আগুন বেরুচ্ছে যেন। ময়নার চির-ঘুমন্ত দেহখানা কোলে নিযে রাজু গঙ্গার জলে নেমে গেল। কোমর—বুক—গলা—

ভাদ্রের ভরা গঙ্গা—রাজু শুনতে পেল কচি ছেলেটা কাঁদছে, —টুঁয়া টুঁয়া—

উঠে যাবে নাকি? ঐ কচি ছেলেটাকে আবার মানুষ করে তুলতে হবে নাকি রাজুকে? আবার ওর কাছে রাজু জীবনের জয়গান শুনবে নাকি? না—নাঃ! জীবনের বন্ধনের অভিশাপ রাজু কুড়োবে না আর।